

দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

দাজ্জাল?
ইহুদি-খ্রিষ্টান ‘সভ্যতা’!

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

তওহীদ প্রকাশন

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
তওহীদ প্রকাশন

২০০৮ এর সর্বোচ্চ সংখ্যক বিক্রয়ের রেকর্ড সৃষ্টিকারী বই

দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনায়

তওহীদ প্রকাশন

১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

০১৭১১-০০৫০২৫, ০১৯৩৩-৭৬৭৭২৫

০১৭৮২-১৮৮২৩৭, ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৯৮

দ্বিতীয় প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০১ (সংশোধিত)

তৃতীয় প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩

চতুর্থ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৬

পঞ্চম প্রকাশ: জুন ২০০৮ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত)

ষষ্ঠ প্রকাশ: আগস্ট ২০০৮ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত)

সপ্তম প্রকাশ (১ম মুদ্রণ): ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ (পরিবর্ধিত)

সপ্তম প্রকাশ (২য় মুদ্রণ): ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সপ্তম প্রকাশ (৩য় মুদ্রণ): ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

অষ্টম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৮ (সংশোধিত)

নবম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৯ (সংশোধিত)

দশম প্রকাশ: ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ (সংশোধিত)

একাদশ প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১০

দ্বাদশ প্রকাশ: ১৫ এপ্রিল ২০১০

ত্রয়োদশ প্রকাশ: ২২ জুন ২০১০

চতুর্দশ প্রকাশ: ১ ডিসেম্বর ২০১০

পঞ্চদশ প্রকাশ: ২০ মে ২০১২

ষষ্ঠদশ প্রকাশ: ২ ডিসেম্বর ২০১২

সপ্তদশ প্রকাশ: ১৫ মার্চ ২০১৬

অষ্টাদশ প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০১৮ (সংশোধিত)

ISBN: 978-984-8912-02-7

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ: কাজী আব্দাল্লাহ আল মাহফুজ

মূল্য: ৮০.০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

উন্মুক্ত

এই বইয়ের কোনো স্বত্ব নেই । যে কেউ এই বই মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে পারবেন । শুধু দুইটি শর্ত - (ক) ঐ মুদ্রণ এই বইয়ের নির্ভুল (Exact) নকল হতে হবে, কোথাও সামান্য ভুলও থাকতে পারবে না, অন্তত বক্তব্যের অর্থ বা উদ্দেশ্য বদলে যায় এমন ভুল থাকতে পারবে না । (খ) যদি কেউ কোনো বিষয় (Point, Subject) আরও ভালো করে প্রকাশ করতে চান, বা বইয়ের বক্তব্যের সমর্থনে আরও সুন্দর যুক্তি, প্রমাণ বা তথ্য যোগ করতে চান- এক কথায় এই বইকে আরও সুন্দর, আরও যুক্তিবহ করতে চান, তবে এই বইয়ের কোন্ কোন্ লাইনে কি পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে চান তা উল্লেখ করে এই বইয়ের প্রকাশকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে । এছাড়া ভাষান্তর (Translation) করলেও তা প্রকাশককে দেখিয়ে অনুমতি নিতে হবে ।

ঢাকা
১৫ অক্টোবর, ২০০৯ ঈসায়ী

বিনীত
লেখক

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম কথা

চৌদ্দশ’ বছর থেকে মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনা চলে আসছে। আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব কথা বলে গেছেন, পৃথিবীতে কি কি ঘটনা ঘটবে সেগুলি সম্বন্ধে আভাস ও সরাসরি যা জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বিগ্নকর। উদ্বিগ্নকর ও ভীতিপ্রদ এই জন্য যে দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমগ্র মানবজাতির উপর প্রচ- প্রভাব বিস্তার করে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, সমস্ত মানবজাতিকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করবে। শুধু চেষ্টা নয়, বেশ কিছু সময়ের জন্য দাজ্জাল তার শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে গোটা **মানবজাতিকেই বিপথে পরিচালিত করবে**। কাজেই দাজ্জালকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার বা অবজ্ঞা করার উপায় নেই।

আল্লাহর রসুল বলেছেন, **“আদমের সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় বা ঘটনা হবে না, যা দাজ্জালের চেয়ে গুরুতর ও সংকটজনক** (হাদিস- এমরান বিন হোসায়েন (রা.) থেকে মুসলিম)।” তিনি এ কথাও বলেছেন যে, **“নুহ (আ.) থেকে নিয়ে কোনো নবীই বাদ যান নি যিনি তাঁর উম্মাহকে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করেন নি** (হাদিস- আবু ওবায়দা বিন যাররাহ (রা.) ও আব্দুলাহ বিন ওমর (রা.) থেকে আবু দাউদ, বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযি)।” শুধু তাই নয়, আল্লাহর নবী নিজে দাজ্জালের সংকট (ফেতনা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (হাদিস- আয়েশা (রা.) থেকে বুখারী)।

চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, যে ব্যাপারটা মানবজাতির সৃষ্টি থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয় সম্বন্ধে নুহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে সতর্ক করে গেছেন এবং যা থেকে শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীও আল্লাহর কাছে আশ্রয় (পানাহ্) চেয়েছেন সেটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, বিরাট (হাদিসে বিশ্বনবী “আকবর” শব্দ ব্যবহার করেছেন) এবং আমরা সে সম্বন্ধে কতটুকু সজাগ ও সচেতন? বাস্তব অবস্থা এই যে আমরা মোটেই সজাগ নই এবং নই বলেই আমরা বুঝছিনা যে **৪৮১ বছর আগেই দাজ্জালের জন্ম হয়েছে এবং সে তার শৈশব, কৈশোর পার হয়ে বর্তমানে যৌবনে আছে এবং এও বুঝছিনা যে সমস্ত পৃথিবীসহ আমরা মুসলিমরাও দাজ্জালকে রব, প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছি ও তার পায়ে সিজদায় পড়ে আছি**। প্রকৃত দীন থেকে বিচ্যুত হবার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ এই জাতিকে (যেটা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয় ও নিজেদের

মুসলিম বলে বিশ্বাস করে) কয়েক শতাব্দীর জন্য ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিগুলির দাসে পরিণত করে দিয়েছিলেন এবং ঐ দাসত্বের সময়ে প্রভুদের প্রবর্তিত শিক্ষার ফলে প্রকৃত দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। কাজেই দাজ্জাল সম্বন্ধে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এরা আব্রাহাম লিংকনের কয়টা দাঁত ছিল তা জানেন, শেক্সপিয়ের থেকে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর রসুল যে মানবজাতির জীবনে দাজ্জাল নামে এক মহাবিপদ আবির্ভূত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন তা তাদের কাছে এক কৌতুকপূর্ণ সংবাদ। এই জাতির যে অংশটা কোর'আন-হাদিস পড়েন তারা ছাড়া দাজ্জাল সম্বন্ধে কেউ চিন্তা-ভাবনাও করেন না, কোনো গুরুত্বও দেন না। ঐ যে অংশটা কোর'আন-হাদিস নাড়াচাড়া করেন সেই অংশও দাজ্জালকে নিয়ে মাথা ঘামান না, প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল কী তা বুঝতে চেষ্টা করেন না; কারণ তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তারা অপেক্ষায় আছেন যে আখেরী যামানায় বিরাট এক ঘোড়ায় চড়ে এক চক্ষু বিশিষ্ট এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে। যে হাদিসগুলিতে রসুলাল্লাহ দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলির শাব্দিক অর্থকেই তারা গ্রহণ করেছেন, তার বেশি আর তারা তলিয়ে দেখেন নি বা দেখতে পারেন নি। যে ঘটনাটিকে আখেরী নবী **আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা** বলে চিহ্নিত করেছেন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে তারা কোনো গভীর গবেষণা করেন নি। এই মহা-প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য যতটুকু শ্রম দিয়েছেন তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি শ্রম ও সময় দিয়েছেন দাড়ি-মোছ, টুপি-পাগড়ী, পাজামা, মেসওয়াক, কুলুখ আর বিবি তালাকের মতো তুচ্ছ ফতোয়ার বিশ্লেষণে।

অন্যান্য সবার মতো আমিও অপেক্ষায় ছিলাম আখেরী যামানায় বিরাট আকারের এক ঘোড়ায় উপবিষ্ট এক চোখ অন্ধ এক দানবের, এবং তার রব, প্রভু হবার দাবির। এই আকিদায় প্রথম ধাক্কা পেলাম মোহাম্মদ আসাদ নামের এক ভদ্রলোকের লেখা রোড টু মেক্কা (Road to Mecca) বইটিতে। এই লেখকের নাম ছিল Leopold Weiss (লিওপোল্ড ওয়াইস), ইনি অস্ট্রিয়ার এক ইহুদি পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রহমে যুবক বয়সেই দীনুল ইসলাম গ্রহণ করেন ও শেষ জীবনে সুন্দর তফসিরসহ কোর'আনের অনুবাদ করেন যেটা লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দাজ্জাল সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে তিনি তার ঐ বইয়ে বলেছেন যে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল। দুঃখের বিষয় মোহাম্মদ আসাদ ঐটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, আর কোনো গবেষণা করেন নি। বইটি পড়েছিলাম খ্রিষ্টীয় উনিশ শ' পঞ্চাশ দশকের শেষ বা ষাট দশকের প্রথম দিকে। তারপর যতই ও সম্বন্ধে ভেবেছি ততই পরিষ্কার হয়েছে যে মোহাম্মদ আসাদ ঠিকই বুঝেছেন। রসুলাল্লাহর সময়ের নিরক্ষর আরবদের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত কৌশলের ওপর ভিত্তি করা মহাশক্তিশালী সভ্যতা সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা অবশ্যই অর্থহীন হতো, তাদের পক্ষে তা বোঝা মোটেই সম্ভব ছিল না। তাই আল্লাহর নবী এটাকে তাদের কাছে রূপকভাবে (Allegorically) বর্ণনা করেছেন।

চৌদ্দশ' বছর আগের নিরক্ষর আরবদের পক্ষে সম্ভব না হলেও বর্তমানে দাজ্জাল সম্বন্ধে মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যাচাই করলে সন্দেহের কোনো স্থান থাকে না যে **মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে আল্লাহর রসুল বর্ণিত সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল।**

বিশ্বনবীর দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলির উৎস হচ্ছে হাদিস। সবাই জানেন যে হাদিসের বেশ কয়েকটি শ্রেণি আছে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি; প্রথম শ্রেণি হলো 'সহিহ' অর্থাৎ সঠিক। দ্বিতীয় হলো 'হাসান', এটাও সঠিক কিন্তু প্রথম শ্রেণির মতো নয়। তৃতীয় হলো 'দয়ীফ' অর্থাৎ দুর্বল, কিন্তু দয়ীফ হলেও গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও হাদিসের গরীব, মুনকার, মা'রুফ ইত্যাদি আরও অনেক শ্রেণি আছে। **হাদিসের সত্যতা-অসত্যতা যাচাইয়ের কঠিন প্রক্রিয়ায় যেমন বহু অসত্য, বানোয়াট হাদিস পরিত্যক্ত হয়েছে, তেমনি অনেক সত্য হাদিসও সত্য হওয়া সত্ত্বেও ইসনাদের অভাবে বাদ পড়ে গেছে।** কোনো একটি বিষয়ে পূর্ণ ধারণা করার জন্য প্রয়োজন ঐ বিষয়টি (Subject) সম্বন্ধে সহিহ, হাসান, দয়ীফ, এমন কি পরিত্যক্ত হাদিসও পর্যালোচনা করে একটি সম্যক ধারণা করা। তাতে ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে একটি পূর্ণ চিত্র মনে ফুটে ওঠে। দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনাতেও আমি এই নীতিই গ্রহণ করেছি, যদিও ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে সহিহ হাদিসগুলির ওপর।

দাজ্জাল সম্বন্ধে মহানবীর হাদিসগুলিকে আমি দু'টো ভাগে ভাগ করেছি। একটা ভাগ দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের ব্যাপারে, অন্যটি দাজ্জালের পরিচয়জ্ঞাপক। মানবজাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সর্ববৃহৎ বিপদের সম্বন্ধে মানুষ বেখেয়াল নিরুদ্বেগ। যারা ধর্মের ব্যাপারে মহা-আলেম হয়েছেন ও ধর্মচর্চার মধ্যে ডুবে আছেন তারাও সংকীর্ণ ও প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য দেখতে ও বুঝতে সক্ষম হন নি যে দাজ্জালের আবির্ভাব মানবজাতি ধ্বংসকারী নুহের (আ.) মহাপ্লাবনের চেয়েও, প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও কেন বড় (আকবর) ঘটনা; কেন মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের (যদি সে ঘটনা সত্য হয়ে থাকে) চেয়েও সাংঘাতিক, যে যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী অর্থাৎ প্রায় এক কোটি আদম সন্তান নিহত হয়েছিল। অন্য ভাগের হাদিসগুলিতে আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতি যেন দাজ্জালকে ঠিকভাবে চিনতে পারে ও সাবধান হয়, দাজ্জালকে প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরোধিতা করে, সে জন্য তার পরিচিতির জন্য চিহ্নগুলি বলেছেন। কিন্তু তার সময়ের মানুষের শিক্ষার স্বল্পতার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে দাজ্জালকে রূপকভাবে বর্ণনা করতে হয়েছে। কিন্তু সে রূপক বর্ণনা আজ পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে, যদিও আমাদের প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য সে বর্ণনাও আমরা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি না, দাজ্জালকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ও দাজ্জালের পায়ে সিজদায় পড়ে থেকেও বুঝতে পারছিনা যে এই সেই বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল, মসীহ উল কায্যাব।

প্রথমেই দাজ্জালের নামটাকে নেয়া যাক। আল্লাহর রসুল একে দাজ্জাল নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটা কোনো নাম নয়, এটা একটা বর্ণনা, অর্থাৎ বিষয়টার

বর্ণনা। যেমন এমাম মাহদী কোনো নাম নয় বর্ণনা। মাহদী অর্থ হেদায়াহ প্রাপ্ত, যিনি সঠিক পথ, হেদায়াহ পেয়েছেন, তাঁর নিজের অন্য নাম থাকবে সবার মতো। তেমনি দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত। যেমন মাকাল ফল, দেখতে অতি সুন্দর, মনে হবে খেতেও অতি সুস্বাদু, কিন্তু আসলে খেতে বিস্বাদ, তিক্ত। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ করে ফেলে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাবাধীন পৃথিবী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবিচারে, দুঃখে, ক্রন্দনে, অশ্রুতে ভরপুর। বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত করেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন ছোট খাটো যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে। আহত বিকলাঙ্গের সংখ্যা ঐ মোট সংখ্যার বহুগুণ। বিধবা, সন্তানহারা, গৃহহারা, দেশত্যাগীদের কোনো হিসাব নেই। আর এই নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা করেছে দশ লক্ষ মানব। ইরাক ছাড়াও আফগানিস্তানসহ আরও অনেকগুলো দেশে তার এই হত্যাযজ্ঞ আজও চলছে। এই 'সভ্যতা'র অধীনস্ত সমস্ত পৃথিবীতে খুন, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, অত্যাচার সীমাহীন এবং প্রতিদিন প্রতি দেশে ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে চলেছে। তাই এর নাম দাজ্জাল, চাকচিক্যময়, চোখ ধাঁধানো প্রতারক।

দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্ব

এক ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন, **আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে শেষদিন (অর্থাৎ কেয়ামত) পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে ও ঘটবে তার মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে বড় আর কিছু ঘটবে না।** [এমরান বিন হোসায়েন (রা.) থেকে মুসলিম]

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস, কারণ দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা বোঝাতে যেয়ে বিশ্বনবী শব্দ ব্যবহার করেছেন 'আকবর', অতি বড়। আরও গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আদমের (আ.) সৃষ্টি থেকে কেয়ামত অর্থাৎ মানবজাতির সৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হওয়াটা কম কথা নয়, নিঃসন্দেহে বলা যায় সাংঘাতিক, কারণ মানবজাতির জীবনে নুহের (আ.) সময়ে মহাপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যেয়ে মানবজাতিসহ সব প্রাণী, পশুপক্ষী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দু'টি বিশ্বযুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যে কমপক্ষে চৌদ্দ কোটি মানব হতাহত হয়েছে, ইতিহাসের আগে আরও অমন সর্বনাশা বিপর্যয় হয়তো হয়েছে। অথচ মহানবী বলছেন, ও সব কিছুর চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার হবে দাজ্জালের আবির্ভাব। মানবজাতির অতীতে কি কি ঘটনা ঘটেছে তা আল্লাহ তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন, কোর'আনই তার প্রমাণ আর ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে তাও যে তাঁর রসুল জানতেন তার প্রমাণ দাজ্জাল ও অন্যান্য বহু ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা বলার সময় অতীতে নুহের (আ.) মহাপ্লাবনের কথা বা ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধের কথা তাঁর মনে ছিল না এ কথা অসম্ভব। কারণ তিনি সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রসুল, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ ভেবেচিন্তে বলা। কাজেই এ এক সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং এমন মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী যা অব্যর্থ, মিথ্যা হতেই পারেনা। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা বেখেয়াল, উদাসীন কিন্তু এর চেয়ে তুচ্ছ হাজারও বিষয় নিয়ে তুলকালাম করছি। এবার দেখা যাক দাজ্জাল অর্থাৎ জড়বাদী, **যান্ত্রিক ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার (Materialistic, Technological Judeo-Christian Civilization) আবির্ভাব মানবজাতির জীবনে সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনা কেন?** এর গুরুত্ব ঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের আদমের (আ.) অর্থাৎ মানবজাতির সৃষ্টির সময়ে ফিরে যেতে হবে।

মহাকাশ, সেই মহাকাশে অগণ্য ছায়াপথ (Galaxy), নীহারিকা (Nebula), অসংখ্য সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, এক কথায় এই মহাবিশ্ব আজ পর্যন্ত যার শেষ পাওয়া যায়নি, তা শুধু 'কুন' আদেশ দিয়ে সৃষ্টি করার পর আল্লাহর ইচ্ছা হলো এমন

একটি সৃষ্টি করার যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকবে। এই বিপুল, বিরাট মহাবিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু তাঁর বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলছে, ঐ নিয়ম থেকে একটি চুলের কোটি ভাগের এক ভাগও সরে যাবার ক্ষমতা বা শক্তি কারো নেই, সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কাউকে আল্লাহ দেন নি। এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তিনি তাঁর মালায়েকদেরও দেন নি; যে মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তা থেকে এক পরমাণু পরিমাণও ভ্রষ্ট হবার শক্তি তাদের দেন নি। এবার তাঁর ইচ্ছা হলো তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তাঁর কোনো সৃষ্ট জীবকে দিয়ে দেখা ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সে কি করে (সুরা দাহর, আয়াত ২, ৩)। তাই আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আদমকে (আ.)। যেহেতু এর দেহের ভেতর তিনি তাঁর নিজের আত্মা স্থাপন করবেন, সেই সম্মানে আদমের দেহ তিনি তৈরি করলেন 'কুন' আদেশ দিয়ে নয়, তাঁর নিজের হাতে (সুরা সা'দ, আয়াত ৭৫)। তারপর তার দেহের মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা থেকে ফুঁকে (প্রবেশ করিয়ে) দিলেন (সুরা হেজর, আয়াত ২৯; সুরা সাজদা, আয়াত ৯; সুরা সা'দ, আয়াত ৭২)। আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা, যেটাকে তিনি বলছেন আমার আত্মা, সেটা থেকে আদমের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া অর্থ আল্লাহর কাদেরিয়াত অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর সমস্ত সিফত, গুণ, চরিত্র আদমের মধ্যে চলে আসা। আল্লাহর রূহ আদমের অর্থাৎ মানুষের ভেতরে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যান্য সমস্ত সৃষ্ট জিনিসের চেয়ে বহু ঊর্ধে উঠে গেলো, কারণ তার মধ্যে তখন স্বয়ং আল্লাহর সমস্ত সিফতসহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এসে গেলো যা আর কোনো সৃষ্টির মধ্যে নেই। সে হয়ে গেলো আশরাফুল মাখলুকাত, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর রূহ যে তিনি মানবের দেহের ভেতর স্থাপন করলেন **এটাই হলো মানুষের কাছে তাঁর আমানত,** যে আমানত মানুষ ছাড়া আর কারো কাছে নেই (সুরা আহযাব, আয়াত ৭২)।

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে মানুষ কি করে সে পরীক্ষা করতে গেলে অবশ্যই একটি বিরুদ্ধশক্তি প্রয়োজন, না হলে পরীক্ষাই অর্থহীন, খালি মাঠে গোল দিলে তো আর পরীক্ষা হয় না, তাই আল্লাহ দাঁড় করালেন ইবলিসকে। তাকে শক্তি দিলেন মানুষের দেহমনের মধ্যে ঢুকে কুপরামর্শ দিয়ে তাকে প্রভাবিত ও পথভ্রষ্ট করার। আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ইবলিস মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে একজন। আদম অর্থাৎ আল্লাহর খলিফা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে মালায়েকদের মতামত জানতে চাইলে ইবলিসসহ তারা সবাই বলেছিল- কেন আদম সৃষ্টি করতে চাও? আমরাইতো তোমার গুণকীর্তণের জন্য যথেষ্ট, **তোমার এ সৃষ্টিতো ফাসাদ (অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি) আর সাফাকুদ্দিমা (যুদ্ধ, মারামারি, রক্তপাত) করবে** (সুরা বাকারা, আয়াত ৩০)। এখানে প্রশ্ন আসে- আল্লাহ তখনও আদমকে সৃষ্টিই করেননি। শুধু বলেছেন সৃষ্টি করতে চাই, এটুকু শুনেই মালায়েকরা কি করে বললো, সৃষ্টি করার পর এই নতুন সৃষ্টিটি কি করবে? এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ যদি শুধু এইটুকু বলতেন যে আমি আদম নামে একটি জীব সৃষ্টি করতে চাই

তবে মালায়েকরা কিছুই বলতো না। কিম্বা হয়তো বলতো প্রভু! তুমি লক্ষ কোটি সৃষ্টি করেছ, আরও একটি করবে, এতে আমাদের কী বলার আছে? তোমার ইচ্ছা হলে করো। কিন্তু আল্লাহ তা বলেন নি, তিনি বলেছিলেন আমি পৃথিবীতে আমার **খলিফা** সৃষ্টি করতে চাই (কোর'আন- সুরা বাকারা, আয়াত ৩০)। এই খলিফা শব্দ থেকেই মালায়েকরা বুঝে গেল যে এই নতুন সৃষ্টিটি তাদের মতো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিহীন একটি সৃষ্টি হবে না কারণ খলিফা অর্থ প্রতিনিধি, এবং প্রতিনিধি অর্থ হলো যার প্রতিনিধি তার শক্তি তার মধ্যে অবশ্যই থাকা, কমই হোক, বেশীই হোক। তারা বুঝলো এই নতুন সৃষ্টি আদমের অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধির মধ্যে থাকবে আল্লাহর সিফত, আল্লাহর গুণসমূহ যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অন্তর্ভুক্ত। **স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকা অর্থই হচ্ছে আল্লাহর দেখানো পথ, হেদায়াহ মানা বা সেটা না মেনে নিজের ইচ্ছামত পথে চলার শক্তি।** আর আল্লাহর দেখানো পথে না চলে নিজের তৈরি পথে চলার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে ফাসাদ (সমাজের মধ্যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি) এবং সাফাকুদ্দিমা (যুদ্ধ, মারামারি, হত্যা, রক্তপাত) তাই মালায়েকরা আদমকে সৃষ্টির আগেই সে কথা বলতে পেরেছিল।

অতি সংক্ষেপে এর পরের ঘটনাগুলি হচ্ছে এই যে, আদমের (আ.) অর্থাৎ মানুষের দেহ নিজ হাতে তৈরি করে তার দেহের ভেতরে আল্লাহর নিজের রূহ, আত্ম থেকে ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ মালায়েকদের আদেশ করলেন আদম অর্থাৎ মানুষকে সাজদা করতে (সুরা বাকারা, আয়াত ৩৪; সুরা আ'রাফ, আয়াত ১১)। ইবলিস অস্বীকার করলো ও আল্লাহকে বললো আমরা মালায়েকরা বলেছিলাম তোমার এই নতুন সৃষ্টি এই আদম, তোমার এই খলিফা পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার আর যুদ্ধ, মারামারি, রক্তপাত করবে। আমাদের এই কথা যে সত্য তা প্রমাণ করে দেখাবো। আল্লাহ ইবলিসের অর্থাৎ শয়তানের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, কারণ তাঁর খলিফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল তাই পরীক্ষা করা যে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিধর খলিফা কোন্ পথে চলে তা দেখা। ইবলিসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি এই নতুন খেলার নিয়মকানুন, শর্ত ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেগুলো হলো মোটামুটি এই:

ক) ইবলিসকে অনুমতি ও শক্তি দেওয়া গেলো যে সে আল্লাহর খলিফা আদমের দেহে, মন-মগজে, শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করতে পারবে ও তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারবে।

খ) আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি জনপদে তাঁর নবী-রসুলদের পাঠিয়ে মানুষকে হেদায়াহ অর্থাৎ পথ প্রদর্শন করবেন (সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭; সুরা নাহল, আয়াত ৩৬; সুরা রা'দ, আয়াত ৭)। সে হেদায়াহ হলো তওহীদ, জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ অস্বীকার করা এবং একমাত্র তাঁরই আদেশ-নিষেধ পালন করা।

এরপর বনি আদমের সম্মুখে **সমষ্টিগত জীবন পরিচালনার জন্য দু'টি মাত্র পথ খোলা রইলো।** হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নবী-রসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধানকে (দীন) সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা অথবা ইবলিসের পরামর্শ মেনে নিয়ে **স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে** নিজেদের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজেরাই আইন-কানুন তৈরি করে সেই মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করা। তৃতীয় কোনো পথ রইলো না।

এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার অসীম জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য জ্ঞানের অধিকারী বনি আদমকে পরিস্থিতি ভালো করে বুঝে নেবার জন্য আল্লাহ তাদের জানিয়ে দিলেন যে- ঐ দুই পথের মধ্যে যে বা যারা তাঁর সার্বভৌমত্বকে (Sovereignty) স্বীকার করে নিয়ে নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধকে তাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে তাদের তিনি গ্রহণ করবেন, ব্যক্তিগত সমস্ত অপরাধ, গোনাহ মাফ করে তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি সমস্ত কোর'আনে ও সহিহ হাদিসে ছড়িয়ে আছে। এটাকে আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর রসুল তাঁর বিশিষ্ট সাহাবা আবু যরকে (রা.) বললেন- যে লোক মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর তওহীদের ওপর অটল থাকবে সে ব্যভিচারী ও চোর হলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে (আবু যর গেফারী (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম)।

এ ছাড়াও তিনি বহুবার বহুভাবে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে- আল্লাহর সার্বভৌমত্বে, সেরাতুল মুস্তাকীমে অর্থাৎ তওহীদে যে অটল থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার পৃথিবী ভর্তি গোনাহও তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না। এ ব্যাপারে বুখারী, মুসলিমসহ অসংখ্য হাদিস পেশ করা যায়। আল্লাহর নবী বলেছেন- **বান্দাদের সাথে আল্লাহর চুক্তি (Contract) হচ্ছে যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না, তাহলেই আল্লাহ তাদের কোনো শাস্তি দেবেন না** (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন); (হাদিস- মো'য়াজ (রা.) থেকে বুখারী, মুসলিম)।

তিনি আরও বলেছেন- **যে হৃদয়ে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (দ.) তাঁর রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন** (ওবায়দাহ বিন সোয়ামেত (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বুখারী, মুসলিম)। আল্লাহর রসুল আরও বলেছেন- **জান্নাতের চাবী হচ্ছে তওহীদ** (মু'য়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে আহমদ)। এখানে মনে রাখতে হবে যে **এই তওহীদ বর্তমানের ব্যক্তিজীবনের আংশিক তওহীদ নয়, এ তওহীদ সার্বিক জীবনের তওহীদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনের তওহীদ** অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।

এই তওহীদের বিপরীতে শেরক ও কুফর সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন আমার ইচ্ছা হলে আমি মানুষের সমস্ত গোনাহ, অপরাধ ক্ষমা করে দেবো, কিন্তু শেরক ও কুফর ক্ষমা করব না। কুফর হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে

মানুষের সমষ্টিগত জীবনের জন্য আইন-কানুন, দ-বিধি ইত্যাদি তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা, আর শেরক হলো আল্লাহকে আংশিকভাবে স্বীকার করে ও আংশিকভাবে অস্বীকার করে জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছামত আইন-কানুন বা নিয়ম-পদ্ধতি তৈরি করে সেইমত চলা। জীবনের যে কোনো একটি মাত্র অঙ্গনেও আল্লাহর আইনের বদলে অন্য কোনো আইন মানা শেরক। আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে তিনি শেরক (তাকে আংশিকভাবে অস্বীকার করা) ও কুফর (তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা) কখনও ক্ষমা করবেন না (সুরা নেসা, আয়াত ৪৮, ১১৬ ও সুরা মোহাম্মদ, আয়াত ৩৪)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যারা সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যে সত্যিকারভাবে স্বীকার করে নিলো তারা তওহীদ গ্রহণ করলো, সেরাতুল মুস্তাকীমে যাত্রা শুরু করলো, দীনুল কাইয়্যেমাতে কায়েম হলো **তারা পৃথিবীপূর্ণ ব্যক্তিগত গোনাহ নিয়েও আল্লাহর সামনে হাজির হলে আল্লাহ সব ক্ষমা করে তাদের জান্নাত দেবেন** (আবু যর (রা.) থেকে তিরমিযি, তিবরানী ও বায়হাকী)। অন্যদিকে ঐ তওহীদে যারা নেই অর্থাৎ সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নাই, বা আংশিকভাবে করেছে, তারা ব্যক্তিজীবনে যত সওয়াব ও পুণ্যের কাজই করুক আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না, তাদের জাহান্নামে দেবেন। অর্থাৎ **সমষ্টিগত ও সার্বিক তওহীদ ব্যক্তিগত জীবনের সৎকাজ, তাকওয়ার পূর্বশর্ত, ওটা না থাকলে পৃথিবীপূর্ণ নেক কাজ, সারা রাত্রির নামায, সারা বছরের রোযা নিষ্ফল** (সুরা আন'আম, আয়াত ৮৮, এবং সুরা যুমার, আয়াত ৬৫ ও হাদিস)।

আল্লাহর খলিফা আদমকে (আ.) তৈরি করার বিরুদ্ধে ইবলিস ও মালায়েকদের যে যুক্তি ছিল তা হলো এই যে, আদম অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে ফাসাদ (অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অশান্তি) ও সাফাকুদ্দিমা (রক্তপাত অর্থাৎ যুদ্ধ, মারামারি, হত্যা) করবে (সুরা বাকারা, আয়াত ৩০)। ইবলিস ও মালায়েকরা এ কথা বলে নি যে মানুষ নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না, যাকাহ দেবে না, হজ করবে না, তারা চুরি, ডাকাতি ব্যভিচার করবে, মদ খাবে, জুয়া খেলবে। তারা **যে দু'টো কারণ বলেছিল সে দু'টোই সমষ্টিগত প্রশ্ন, ব্যক্তিগত নয় এবং একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে এই দু'টি সমষ্টিগত সমস্যাই আজ পর্যন্ত চলে আসছে এবং আজও এর সমাধান করা যায় নি**। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস (League of Nations) তৈরি করেও নয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (United Nations) গঠন করেও নয়। কারণ সোজা- আল্লাহ মানুষকে অতি অল্প জ্ঞান দিয়েছেন, সে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য জানে না; সৃষ্টির কেন, তার নিজের দেহ ও মন কেমন করে কাজ করে তাও সে ভালো করে বোঝে না। কাজেই মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব যে সে এমন একটা জীবন-বিধান, জীবন-ব্যবস্থা, সংবিধান তৈরি করবে যেটা মেনে চললে তার সমষ্টিগত জীবনে ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমা না থাকে। এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

স্বীকার করে নবী-রসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত জীবন-বিধান (দীন) সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইবলিসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যখন তাকে মানুষের দেহ-মনের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে মানুষকে প্রভাবিত ও প্ররোচিত (ওয়াসওয়াসা) করার অনুমতি দিলেন তখন ইবলিস আল্লাহকে বললো- **আমি তোমার সেরাতুল মুস্তাকীমের ওপর তাদের (আদম সন্তানের) জন্য ওঁৎ পেতে থাকব**। সেখান থেকে আমি তাদের ওপর সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে আক্রমণ করব (সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করার জন্য); (সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৬-১৭)। আদম সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তির মধ্যে যেমন ইবলিস নামায, রোযা, হজ, যাকাহ ও অন্যান্য ইবাদত করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টার কথা বলে নি, মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করার চেষ্টার কথা বলে নি, আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করার সময়ও ইবলিস ওগুলোর কোনো কথাই বললো না, বললো আদমকে তোমার দেয়া সেরাতুল মুস্তাকীমের সহজ সরল রাস্তায় আমি ওঁৎ পেতে বসে থাকবো, তোমার সৃষ্ট আদম, বনি-আদম যখন ও পথে চলবে তখন আমি তার সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডাইনে থেকে, বামে থেকে অর্থাৎ চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ (Ambush) করবো তাকে তোমার ঐ সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে **বনি আদমকে নামায, রোযা, হজ, যাকাহ ইত্যাদি ইবাদত থেকে বিরত করা বা গোনাহে লিপ্ত করাই ইবলিসের লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করা**। সুতরাং সেরাতুল মুস্তাকীম নামায, রোযা, হজ, যাকাতের চেয়ে বা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কী এই সেরাতুল মুস্তাকীম? কী এই সহজ সরল পথ? এর নাম সহজ সরল কেন? **এর পরিষ্কার জবাব হচ্ছে- তওহীদ, সর্বব্যাপী তওহীদ, জীবনের সর্ব অঙ্গনের (Facet), সর্ব বিভাগের তওহীদ**। সামগ্রিক জীবনের কোনো অঙ্গনে আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন (শরিয়াহ) ছাড়া আর কাউকে, কোনো কিছুকে না মানা, এই সহজ সরল কথা। এই জন্যই আল্লাহর রসুল আল্লাহর ঐ নীতিকে (সুন্নাতাল্লাহ) ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যাদের ঐ সেরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ তওহীদ থেকে ইবলিস বিচ্যুত করতে পারবে না তারা জীবনে যত বড় গোনাহই করুক, এমন কি এই দীনে যে দু'টি মহাপাপের শাস্তি সর্বোচ্চ, অর্থাৎ ব্যভিচার ও চুরি, সে দু'টি করলেও আল্লাহ তা মাফ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ঐ সঙ্গে বিশ্বনবী মাটিতে একটি সরল রেখা টেনে বললেন- এই হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা, সেরাতুল মুস্তাকীম। তারপর তিনি ঐ সোজা রেখা থেকে দুই দিকে কতগুলি রেখা টেনে বললেন- এগুলি ঐ সমস্ত রাস্তা যে রাস্তায় যাবার জন্য শয়তান ডাকতে থাকবে। এই বলে তিনি কোর'আন থেকে পড়লেন- **"নিশ্চয়ই এই হচ্ছে আমার (আল্লাহর) সহজ, সরল পথ। এই পথে চলো, অন্যান্য পথে চলো না। কারণ ঐ সব পথ**

তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে” (হাদিস- আব্দুলাহ্ বিন মাসুদ (রা.) থেকে আহমদ, নেসায়ী, মেশকাত)।

পেছনে বলে এসেছি মালায়েকরা (ইবলিস যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল) মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যে দু'টি যুক্তি আল্লাহর কাছে পেশ করেছিল, অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা দু'টোই সমষ্টিগত বিষয়, ব্যক্তিগত নয়। ফাসাদ শব্দের মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বরকমের অন্যায়, অত্যাচার, অশান্তি এসে যায়। আর সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ রক্তপাত শব্দের মধ্যে মারামারি, সংঘর্ষ, ছোট বড় যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ সব এসে যায়। অর্থাৎ ইবলিস আল্লাহকে যে চ্যালেঞ্জ দিলো তার পরিষ্কার অর্থ হলো, 'তোমার খলিফা অর্থাৎ বনি-আদম, মানবজাতিকে আমি ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমায় পতিত করাবো এবং তা করাতে গেলে আমাকে মানুষকে তোমার ইবাদত করা থেকে, নামায, রোযা, হজ, যাকাহ ও অন্যান্য সওয়াবের কাজ থেকে বিরত করার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র তাকে সেরাতুল মুস্তাকীম, তোমার তওহীদ, তোমার সার্বভৌমত্ব থেকে বিচ্যুত করতে পারলেই তো সে অবশ্যম্ভাবীভাবে ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে, আর তা হলেই তো আমার কেল্লা ফতেহ হয়ে গেল। **তোমার সার্বভৌমত্ব থেকে বিচ্যুত করার পর সে যত খুশি নামায, রোযা, হজ, যাকাহ করতে থাকুক আমার কোনো আপত্তি নেই,** কারণ আমার চ্যালেঞ্জে তো আমি জিতে গেলাম। এই জন্যই ইবলিস কখনো আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দেয় নি যে, আদমকে ইবাদত থেকে বিরত করাবার, বা গোনাহে লিপ্ত করাবার চেষ্টা করবে, সে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে সেরাতুল মুস্তাকীমের, তওহীদের, সহজ-সরল রাস্তা থেকে আদমকে বিচ্যুত করাবার। এর বিপরীতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিলেন- আমার তওহীদকে, আমার সার্বভৌমত্বকে যে বা যারা স্বীকার করে নেবে, তা থেকে বিচ্যুত হবে না তারা কত ইবাদত করেছে, তারা কত গোনাহ করেছে, কিছুই আমি দেখবো না, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো, তারা ব্যভিচার ও চুরি করলেও (আবু যর (রা.) থেকে বুখারী, মুসলিম এবং আরও অসংখ্য হাদিস, ও কোর'আন)। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে বা যারা শেরক করবে অর্থাৎ আমার সর্বব্যাপী তওহীদের কোথাও অন্যকে এতটুকু স্থান দেবে তাকে বা তাদেরকে আমি ক্ষমা করবো না, তাদের জাহান্নামে স্থান দেবো। তারা যত ভালো আমলই করুক আমি তা গ্রহণ করবো না (সুরা যুমার, আয়াত ৬৪-৬৬)।

আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহর এই চরমপন্থী মনোভাব কেন? কারণ আছে। মানুষ সমষ্টিগত জীবনে যে সংবিধান, আইন-কানুন, দ-বিধি, নিয়ম-পদ্ধতি স্বীকার করে তা মেনে চলে তার প্রভাব অতি শক্তিশালী, তা ব্যক্তি জীবনের কাজকর্মকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিগত জীবন-পদ্ধতি যদি সমষ্টিগত জীবন-ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন হয় তবে সমষ্টিগত জীবনের বৃহত্তর প্রভাবে ও চাপে ব্যক্তিগত জীবন-পদ্ধতি ক্রমে দুর্বল হতে হতে বিলীন হয়ে যাবে। আর যদি

ব্যক্তিগত জীবন-পদ্ধতি সমষ্টিগত জীবন-ব্যবস্থার বিপরীত হয় তবে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হবে এবং সে সংঘর্ষে ব্যক্তিগত জীবন-পদ্ধতি অবশ্যই পরাজিত হবে। জোনাকী পোকার নিজের দেহের আলোকে তার ব্যক্তিগত কিছুটা কাজ হতে পারে কিন্তু তা রাতের অন্ধকার দূর করতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ হলো, যদি মানবজাতিকে একটি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অশান্তিহীন জীবন যাপন করতে হয়, অর্থাৎ যে জীবনে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা নেই তবে তাকে অবশ্যই এমন একটি সংবিধান ও ঐ সংবিধান নিঃসৃত আইন-কানুন, দ-বিধি প্রণয়ন করতে হবে যা নিখুঁত ও নির্ভুল। মানবজাতির পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ তার জ্ঞানের পরিধি ছোট, সীমিত। আইন-কানুন ও দ-বিধির ভিত্তি হচ্ছে মানুষের মনস্তত্ব। বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনোবিদ, মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন- আমরা মানুষের বিশাল মনস্তত্বের শুধু দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। কাজেই মানুষের পক্ষে ঐ রকম একটি নির্ভুল ও নিখুঁত সংবিধান, জীবন-ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ মানুষকে বলেছেন- আমার সার্বভৌমত্ব মেনে নাও, আমিই বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা, তোমাদের দেহ ও মনেরও স্রষ্টা, তাই আমি জানি কেমন সংবিধান, আইন-কানুন, দ-বিধি মেনে চললে তোমরা ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমাহীন সমাজে বাস করতে পারবে, শান্তিতে (ইসলামে) বাস করতে পারবে। আর যদি আমারই দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে আমার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে নিজেরা সার্বভৌম হয়ে সংবিধান, আইন-কানুন ও দ-বিধি, অর্থনীতি তৈরি করে তাই মেনে চলো তবে ইবলিস যে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় তোমাদের ফেলবে বলেছিল তোমরা তাতেই পতিত হবে, তাহলে সে আমাকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল তাতে সে জয়ী হবে, আমি পরাজিত হবো। আমি সর্বশক্তিমান, আমি ইচ্ছা করলেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এই মুহূর্তেই আমার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেবে (সুরা আন'আম, আয়াত ৩৫, সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯)। কিন্তু আমি তা করবো না, আমি দেখতে চাই আমার দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে তোমরা কী করো। সার্বিক জীবনে আমার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে **তোমরা যত সওয়াবের কাজই কর, যত ইবাদতই কর, যত তাকওয়াই কর সমস্ত আমি ধুলা-ময়লার মতো ছুঁড়ে ছিটিয়ে ফেলে দেবো** (সুরা ফোরকান, আয়াত ২৩)।

আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত হাজার হাজার (হয়ত লক্ষ লক্ষ) বছর ধরে মানুষের প্রতি জনপদে আল্লাহ তাঁর প্রেরিতদের, নবী-রসুলদের পাঠিয়ে আসছেন (সুরা রা'দ, আয়াত ৭, সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭, সুরা নাহল, আয়াত ৩৬)। সময় ও স্থানভেদে আইন-কানুন তফাৎ হয়েছে, কিন্তু মূল ভিত্তি সব সময় ঐ এক কথা- তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। **কারণ সার্বভৌমত্ব তাঁর না হলে সংবিধানও তাঁর হবে না এবং সংবিধান নিঃসৃত আইন-কানুন, দণ্ডবিধিও তাঁর হবে না এবং তা না হলেই তা হতে হবে মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর এবং পরিণতি হবে সেই ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা।** আর আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিলেই সংবিধান হবে

তাঁর বাণী (পূর্বে অন্যান্য কেতাব, বর্তমানে কোর'আন), আর তা থেকে নিঃসৃত আইন-কানুন, দ-বিধি, দীন। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একের পর এক নবী ও রসুলদের আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তারা এসে ঐ একই বাণী প্রচার করেছেন, তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকীম, দীনুল কাইয়্যেমা, শাশ্বত-চিরন্তন, সনাতন ধর্ম। নবী রসুলরা চলে গেলে শয়তানের প্ররোচনায় তাঁদের উম্মাহ তাদের দীনকে বিকৃত করে ফেলেছে। তাদের মধ্যে একটা পুরোহিত শ্রেণি গজিয়েছে, যারা সারা জীবন ঐ দীন নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। শরিয়াহ'র বিধানগুলোকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে করে নতুন নতুন ফতোয়া বের করেছে ও তা জনসাধারণকে শিখিয়েছে। সহজ সরল পথ সেরাতুল মুস্তাকীমকে এক দুর্বোধ্য, জটিল বিষয়ে পরিণত করে জাতিকে মূল লক্ষ্য থেকেই বিচ্যুত করে ফেলেছে। তারা আল্লাহর কেতাবে যোগ-বিয়োগ করে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী আদেশ নির্দেশগুলিকে বদলিয়ে স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে এসেছে। কঠিন আদেশগুলি, যেগুলি পালন করতে গেলে ক্ষতি হয়, ত্যাগের, কোরবানির প্রয়োজন হয় সেগুলিকে বাদ দিয়ে সহজ কাজগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এমনি করে বিকৃতি যখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, সে দীন পালন করলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন সেটাকে শুধরিয়ে ভারসাম্যে ফিরিয়ে নেবার জন্য রহমানুর রহিম আল্লাহ আবার তাঁর নবী-রসুল পাঠিয়েছেন।

এইখানে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে, কারণ আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত, অর্থাৎ মানবজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা জড়িত। কথাটা হচ্ছে এই: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে প্রতি জনপদে আল্লাহ প্রেরিত নবী-রসুলদের আসা, তাঁদের চলে যাবার পর দীনকে বিকৃত করা, সে বিকৃতি শোধরাতে আবার নবী-রসুলদের আসা- এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যে একটি বিষয় দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়ভাবে চলে এসেছে। সেটা হচ্ছে- মানবজাতি তার জীবন-ব্যবস্থার আইন-কানুনের উৎস হিসাবে কখনই স্রষ্টাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করে নাই, আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে কখনও অস্বীকার করে নাই। আল্লাহর দেয়া দীনকে, আইন-কানুন দ-বিধিগুলিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্য, অন্যকে শোষণ করার জন্য দুমড়িয়ে, মুচড়িয়ে বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু ঐ বিকৃত রূপরেখাকেও ধর্মের অনুশাসন বলেই চালাতে হয়েছে। সার্বভৌম হিসাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে সার্বভৌমত্ব নিজেদের হাতে কখনই তুলে নেয়া হয় নি, নেবার চেষ্টাও করা হয় নি। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করা দরকার কারণ দাজ্জাল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন যে তাকে আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতির জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়টার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। এই যে বললাম যে মানুষ কখনই আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে অস্বীকার করে নাই- এ কথাটার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ধর্মের অনুশাসন বলে হুকুম চালালেও ক্রমশ বিকৃতি

এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শুধু মুখে স্বীকৃতি দিলেও কার্যত সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে চলে গেছে। যেমন - ফেরাউন নিজেকে ‘রা’ অর্থাৎ সূর্যের উপাসক বলে প্রচার করলেও সে নিজেই সার্বভৌম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ফেরাউনের এই সার্বভৌমত্ব ছিল কার্যত, আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, সে তার সার্বভৌমত্ব সূর্য দেবতা ‘রা’- এর নামে চালাত। দ্বিতীয়তঃ তার ঐ সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ) সীমিত ছিল মিশরে, পৃথিবীময় নয়। **দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের এই সার্বভৌমত্ব কার্যত ও আনুষ্ঠানিক উভয়ই এবং পৃথিবীময়, তাই এটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা।**

দু’টি উদাহরণ দিচ্ছিঃ আল্লাহর নবী মুসার (আ.) দীনকে পুরোহিত শ্রেণি, রাব্বাই, সাদ্দুসাই ও ফারিসীরা যখন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ও নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে বিকৃত করে ফেললো, তখন সেটাকে শোধরাতে, ওটাকে নতুন জীবন দিতে আল্লাহ পাঠালেন তাঁর অন্য নবী ঈসাকে (আ.)। ইহুদিদের ঐ আলেম শ্রেণি, রাব্বাই-সাদ্দুসাইরা আল্লাহর কেতাব তওরাত পড়াশোনা করেছেন সারা জীবন, তওরাতের আইন-কানুনের ওপর কঠোর গবেষণা করেছেন, তারা কখনোই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন নাই, তাঁর কেতাব তওরাতকেও অস্বীকার করেন নাই। তওরাতের আইন-কানুনগুলিকে তারা অতিবিশ্লেষণ করে বিকৃত করে ফেলেছিলেন, কিন্তু ঐ বিকৃত আইনগুলিকে তাদেরকে তওরাতের আইন বলেই চালাতে হয়েছে। রাব্বাই-সাদ্দুসাইরা এ কথা বলতে পারেন নি, বা বলেন নি যে তওরাতের আইন-কানুন অচল হয়ে গেছে, তাই আমরা আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি এসব নতুন করে তৈরি করছি। এই উপমহাদেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসও তাই। মনু অর্থাৎ নুহের (আ.) মাধ্যমে আল্লাহ যে শরিয়াহ অর্থাৎ আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন পরবর্তীতে তা পুরোহিত শ্রেণি তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য বিকৃত করে ফেললেও তা ঐ মনুসংহিতার নামেই অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া আইন বলেই চালাতে হয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজারা দেশ জাতি শাসন করতেন কিন্তু আইন ও আইনের ব্যাখ্যা দিতেন পুরোহিতরা শাস্ত্র দেখে দেখে, রাজাদের সাধ্য ছিল না তা অস্বীকার করে নিজেরা আইন তৈরি করে নেবার। তা করতে গেলে বা শাস্ত্র লংঘন করতে গেলে তৎক্ষণাৎ মাৎস্যন্যায় (বিদ্রোহ করে রাজাকে হত্যা) হয়ে যেতো। এমনকি যাদের মধ্যে আল্লাহর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী আবির্ভূত হলেন, যাদের আমরা মোশরেক ও কাফের বলে জানি তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা বলে জানত।

এ কথার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিচ্ছেন। তিনি তাঁর রসুলকে বলছেন- তুমি যদি তাদের (আরবের অধিবাসীদের) জিজ্ঞাসা কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে সেই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী (আল্লাহ); (সুরা যুখরুফ, আয়াত ৯)। অন্যত্র বলছেন- তুমি যদি তাদের প্রশ্ন কর- আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে সূর্য ও চাঁদকে তাদের (কর্তব্য কাজে)

নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণ করছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ (সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬১)। আল্লাহ আবার বলছেন- যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর- মাটি (পানির অভাবে শুকিয়ে যেয়ে) মরে যাবার পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে কে তাকে আবার পুনর্জীবন দান করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ (সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬৩)। তিনি আবার বলছেন তাঁর রসুলকে- যদি তাদের প্রশ্ন কর, কে এই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- আল্লাহ (সুরা লোকমান, আয়াত ২৫)। আল্লাহর শেষ রসুল যখন আরবের তথা পৃথিবীর মোশরেক ও কাফেরদের তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে ডাক দিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল- আমরা কি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না? অবশ্যই বিশ্বাস করি, আমরা হুবাল, লাত, মান্নাতকে পূজা করি তো শুধু এই জন্য যে তারা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে (সুরা ইউনুস, আয়াত ১৮)। আমরা কি কাবাকে আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করি না? অবশ্যই করি। আমরা কি আমাদের সন্তানদের নাম আব্দুল্লাহ রাখি না? আমরা প্রতি কাজ কি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করি না? নিশ্চয়ই করি। তাহলে তুমি আমাদের আবার কোন্ তওহীদ শেখাতে চাও? মোটকথা আদম (আ.) থেকে নিয়ে মানবজাতি কখনই আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করে সার্বভৌমত্বকে নিজেদের হাতে তুলে নেয় নি। **কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকে এটাই ছিল ইবলিসের ঘোষিত লক্ষ্য।** যখন সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে তোমার খলিফাকে আমি তোমার সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করবো, তখন সে এ কথাই বুঝিয়েছিল যে সে তাকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করাবে, তাঁর সর্বব্যাপী তওহীদকে অস্বীকার করাবে।

যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি জনপদে নবী-রসুল পাঠিয়ে মানুষকে হেদায়াহ্, পথ-প্রদর্শনের প্রক্রিয়ায় আল্লাহ বনি-ইসরাইলিদের মধ্যে পাঠালেন তাঁর নবী মুসাকে (আ.)। যে কয়েকজন নবী আল্লাহর কাছ থেকে শরিয়াহ নিয়ে এসেছেন মুসা (আ.) তাঁদের অন্যতম। শরিয়াহ হলো সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার জন্য নিয়ম-পদ্ধতি, আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি। অর্থাৎ মানব জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই শরিয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত। মুসা (আ.) পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর বনি-ইসরাঈলীদের মধ্যে সেই সব বিকৃতি এসে গেলো যেগুলি পূর্ববর্তী সব জাতির মধ্যে এসেছে। মুসার (আ.) উম্মতের মধ্যে একটি পুরোহিত শ্রেণি গজালো যারা শরিয়াহ'র আইন-কানুন গুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে করে নতুন নতুন ফতোয়া আবিষ্কার করে তা জনসাধারণের ওপর চাপাতে থাকলো। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, দীনের আসল উদ্দেশ্যই তাদের সামনে থেকে লোপ পেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শরিয়াহ পালনই তাদের মুখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো।

দীনের এই বিকৃতির শাস্তি হিসাবে আল্লাহ বনি ইসরাইল জাতিকে দেবদেবী পূজক ইউরোপীয় রোমানদের দাসে পরিণত করে দিয়েছিলেন, যেমন একই কারণে পরবর্তীতে মুসলিম নামে পরিচিত জাতিটাকে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান জাতিগুলির দাসে পরিণত করে দিয়েছেন। ঈসা (আ.) যখন বনি-ইসরাইলিদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন তখন তারা দেব-দেবী পূজারী (Pagan) রোমানদের দাস। এই নতুন নবী ঈসা (আ.) তাঁর সঙ্গে কোনো শরিয়াহ আনলেন না কারণ তাঁর পূর্ববর্তী মুসার (আ.) শরিয়াহ তখনও মোটামুটি অবিকৃত ছিল। ঈসা (আ.) বনি-ইসরাইল জাতিকে যা যা বললেন তার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় হলো:-

(ক) আমি মুসার শরিয়াহ (আইন-কানুন, Law of Moses) বাতিল করতে আসি নাই, বরং ওটাকে সত্যায়ন ও সমর্থন করতে এসেছি। এই কথা বলে ঈসা (আ.) বুঝাচ্ছেন যে তিনি মুসার (আ.) শরিয়াহতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে আসেন নি, দীনের আত্মাকে বাদ দেওয়ায় ঐ শরিয়াহ প্রাণহীন হয়ে গেছে, কাজেই সেই প্রাণকে অর্থাৎ ভারসাম্যকে আবার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

(খ) **শুধুমাত্র ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষগুলি ছাড়া অন্য কারো জন্য আমাকে পাঠানো হয় নাই** (বাইবেল- নিউ টেস্টামেন্ট, ম্যাথু ১৫:২৪)। এ কথা বলে ঈসা (আ.) তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের সীমার কথা পরিষ্কার করে দিলেন। পরে আরও পরিষ্কার করলেন যখন তিনি তাঁর প্রধান বারজন শিষ্যকে প্রচার কাজে চারিদিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের তিনি নির্দেশ দিয়ে দিলেন **তোমরা অন্য কোনো জাতির মধ্যে যাবে না, স্যামারিয়ানদের কোনো নগরীতে, শহরে প্রবেশ করবে না। তোমরা শুধুমাত্র ইসরাইলি সমাজের পথভ্রষ্ট মেষগুলির কাছে যেতে থাকবে** (বাইবেল- নিউ টেস্টামেন্ট, ম্যাথু ১০:৬)।

আল্লাহর প্রত্যেক নবীকেই তাঁর পূর্ববর্তী নবীর উম্মাহর পুরোহিত শ্রেণি প্রচ-ভাবে বাধা দিয়েছে, সর্বতোভাবে তাঁর বিরোধিতা করেছে। কোনো নবীই এর ব্যতিক্রম নন। কারণ-

প্রথমত: পূর্ববর্তী নবীর দীনের বিকৃত রূপটাকেই পুরোহিত শ্রেণি প্রকৃত দীন বলে বিশ্বাস করতো। নতুন নবী যখন ঐ বিকৃত রূপের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তখন তারা মনে করেছে- ঐ লোক পথভ্রষ্ট।

দ্বিতীয়ত: দীন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের অহংকার। সারা জীবন ধর্ম বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে গবেষণা পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রচ- অহংকার জন্ম নিয়েছে। পক্ষান্তরে নবী আবির্ভূত হয়েছেন প্রায় প্রতিক্ষেত্রে নিরক্ষর হয়ে, কিন্তু আল্লাহ থেকে সরাসরি জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে। কাজেই পুরোহিত শ্রেণি, আলেমরা ঐ নিরক্ষর মানুষের কথা মানতে রাজি হয় নি।

তৃতীয়ত: ঐ পুরোহিত শ্রেণি আল্লাহর দেয়া কেতাবের বিকৃত ব্যাখ্যা করে কেতাবের আয়াত বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা হারামকে (বাকারা ১৭৪, ইয়াসীন ২০,

২১) (নিষিদ্ধ) জায়েজ করে নিয়েছে তা নতুন নবী অবশ্যই বিরোধিতা করেছেন। পুরোহিত শ্রেণির পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভবও ছিল; কারণ তা মেনে নিলে তাদের অবৈধ রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যায়।

চতুর্থত: পুরোহিত শ্রেণি দেখেছে যে- এই লোককে স্বীকার করে নিলে সমাজের সম্মানিত প্রভাবশালী স্থান থেকে তাদের পতন, এক কথায় কায়েমী স্বার্থের অবসান। এইসব কারণে **এক নবীর উম্মাহর পুরোহিত শ্রেণি কখনও নতুন নবীকে স্বীকার করে নেয় নি।** সব সময় নতুন নবীকে স্বীকার করে নিয়েছে সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে মানুষ। ঈসার (আ.) ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। মুসার (আ.) ধর্মেও পুরোহিত শ্রেণি রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফারিসীরা, অর্থাৎ আলেম শ্রেণি একযোগে উঠে পড়ে লেগে গেলো নতুন নবী ঈসার (আ.) প্রচ- বিরোধিতায়। এই বিরোধিতায় তারা সাহায্য নিলো তাদের শাসক রোমানদের। রোমানরা প্রথমে ইহুদিদের ভেতর ধর্ম নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পোড়তে চায় নি, কিন্তু পুরোহিত শ্রেণি ঈসাকে (আ.) রোমানদের শাসনের ও প্রভুত্বের পক্ষে এক বিপজ্জনক শক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করলো ও অনেক চেষ্টার পর তাদের বিশ্বাস করাতে সমর্থ হলো। এরপর রোমানদের দিয়ে ঈসাকে (আ.) মৃত্যুদ- দিয়ে যখন তা কার্যকরী করার জন্য তাঁকে ক্রুশে ওঠাবার বন্দোবস্ত করলো তখন আল্লাহ মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতাদের দিয়ে সশরীরে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং ঈসার (আ.) যে শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে আলেম ও রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল তার দেহ ও চেহারা একদম ঈসার (আ.) মতো করে দিলেন, তারা ঈসা (আ.) মনে করে তাকেই ক্রুশে উঠিয়ে হত্যা করলো।

আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) মাত্র তিন বছর বনি-ইসরাইলিদের হেদায়াত করার সময় পেয়েছিলেন। এই তিন বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ৭২ জন, মতান্তরে ১২০ জন ইহুদি তাদের ভুল বুঝতে পেরে ঈসার (আ.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ ঈসাকে (আ.) আসমানে উঠিয়ে নেয়া ও ঈসার (আ.) চেহারার জুডাস ইসকারিয়াসকে ঈসা (আ.) মনে করে ক্রুশে উঠিয়ে প্রাণদ- দেয়ার পর ঈসার (আ.) ঐ ৭২ বা ১২০ জন আসহাব প্রাণভয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে ও লুকিয়ে গেলেন, কেউ একেবারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। যারা প্যালেস্টাইনে রয়ে গেলেন তারা গোপনে ঈসার (আ.) দেখানো পথে চললেও প্রকাশ্যে নিজেদের রাব্বাই, সাদ্দুসাই ও ফারিসীদের মতের সমর্থন দিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইলো না। এর কিছুদিন পর পল নামে একজন ইহুদি ঈসার (আ.) ওপর ঈমান আনলেন। ইনি সত্যিই ঈসাকে (আ.) বিশ্বাস করেছিলেন কিনা তা সন্দেহের বিষয় কারণ তার পরবর্তী কাজকর্ম গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, ঈসার (আ.) শিষ্যদের মধ্যে ঢুকে তাদের সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ঈসা (আ.) খ্রিষ্টান ধর্ম বলে নতুন ধর্ম প্রচার করার জন্য আসেন নি, সে চেষ্টাও কখনও করেন নি। ইহুদিদের ধর্ম, অর্থাৎ মুসার (আ.) মাধ্যমে প্রেরিত জুডাই (প্রকৃতপক্ষে সেই তওহীদ, ইসলাম) ধর্ম পুরোহিতদের হস্তক্ষেপের ফলে ভারসাম্য হারিয়ে যে বিকৃতির মধ্যে পতিত হয়েছিল সেই বিকৃতি থেকে সেটাকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন ঈসা (আ.)। ঠিক যেমন বুদ্ধ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন তদানীন্তন বৈদিক, সনাতন ধর্মের বিকৃতিকে শোধরাবার জন্য। পল ঈসার (আ.) শিষ্যদের মধ্যে ঢুকে যে কয়টি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন তার মধ্যে সর্বপ্রধানটি হচ্ছে **ঈসার (আ.) শিক্ষাকে বনি ইসরাইলিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটাকে বাইরে অ-ইহুদিদের মধ্যে প্রচার করা ও তাদের ঈসার (আ.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান করা।** পল যখন ঈসার (আ.) শিষ্যদের তাদের নবীর শিক্ষার বিরোধী এই প্রস্তাব দিলেন তখন তারা কেউ জেরুসালেমে ছিলেন না, ইহুদি আলেমদের ভয়ে তারা স্বদেশ থেকে গ্রীসে, এবং উত্তর-সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে নগরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুসংখ্যক শিষ্য-সাহাবা প্রাণ বাঁচাতে এন্টিয়ক শহরে চলে গিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ঈসার (আ.) বারজন প্রধান শিষ্যদের অন্যতম বারনাবাসও ছিলেন। এদের কাছে পল যখন তার ঐ প্রস্তাব দিলেন তখন তারা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন কারণ **এ প্রস্তাব তাদের শিক্ষক ঈসার (আ.) শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।** বিশেষ করে বাধা দিলেন বিশিষ্ট সাহাবা বারনাবাস। কিন্তু সে বাধা সত্ত্বেও পল সাহাবাদের মত বদলাতে সমর্থ হলেন। বোধহয় কারণ এই ছিল যে ব্যর্থ, পরাজিত ও প্রাণভয়ে পলায়নকারী শিষ্যরা উপলব্ধি করলেন যে, বনি ইসরাইলিদের মধ্যে ঈসার (আ.) শিক্ষা প্রচার অসম্ভব। যেখানে ঈসা (আ.) নিজে ব্যর্থ হয়ে গেছেন সেখানে শিষ্যরা হতাশ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তারা বুঝলেন ঈসার (আ.) নীতি বিসর্জন দিয়ে বাইরে অ-ইহুদিদের মধ্যে প্রচার না করলে ঐ শ'খানেক শিষ্যের পর পৃথিবীতে ঈসার (আ.) শিক্ষা লুপ্ত হয়ে যাবে। **একে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অ-ইহুদিদের মধ্যে প্রচার করা ছাড়া আর উপায় নেই।** তারা বুঝলেন না বা বুঝলেও পাশ কাটিয়ে গেলেন যে ঈসা (আ.) ও কাজ করতে নির্দিষ্টভাবে নিষেধ করে গেছেন কারণ জুডাই ধর্ম ও তার সংস্কার দু'টোই শুধুমাত্র বনি-ইসরাইলিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওর বাইরে ওটা সম্পূর্ণ অচল।

আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে **ইহুদিদের ধর্ম অর্থাৎ জুডাই ধর্ম গোত্রিয় ধর্ম, শুধুমাত্র বনি-ইসরাইলিদের জন্য।** ঈসাকে (আ.) আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন সীমিত দায়িত্ব দিয়ে, শুধু পথভ্রষ্ট বনি-ইসরাইলিদের হেদায়াত করতে। ঈসা (আ.) নিজে ছিলেন মুসার (আ.) ধর্মের অনুসারী, তাঁর প্রত্যেক শিষ্যও ছিলেন ইহুদি, বনি-ইসরাইল। মতভেদ শুধু ছিল রাব্বাই, সাদ্দুসাই ও ফারিসীদের অর্থাৎ আলেম শ্রেণির সাথে, আদর্শগত, আকিদাগত। পল ঈসার (আ.) ঘোর বিরোধী ও তাঁকে নির্যাতনকারীদের প্রথম সারির একজন ছিলেন এটা বড় কথা নয়, কারণ পৃথিবীতে বহু উদাহরণ আছে যেখানে ঘোর বিরোধী নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরে অকৃত্রিম, দৃঢ় সমর্থক হয়ে গেছেন। ওমর বিন খাত্তাব (রা.), খালেদ বিন

ওয়ালিদ (রা.), একরামা বিন আবু জাহেল (রা.) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বড় কথা হলো এই যে, পল ঈসার (আ.) সঙ্গে থেকে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, তাঁর সাহচর্য পান নি। কাজেই ঈসার (আ.) প্রকৃত শিক্ষা ও তার মর্ম তিনি পান নি, অথচ ঈসা (আ.) পৃথিবী থেকে চলে যাবার বেশ পরে, যারা সর্বক্ষণ ঈসার (আ.) সাহচর্যে থেকে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা পেয়েছিলেন তাদের চেয়ে বড় প্রবক্তায় পরিণত হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি যে শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করলেন তা ঈসার (আ.) শিক্ষা থেকে শুধু বহু দূরে নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। যা হোক, পলের দলের ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও প্রচারের ফলে অ-ইহুদিদের মধ্য থেকে অনেক লোক ঈসার (আ.) ওপর বিশ্বাস এনে পলের নেতৃত্বে তার শিষ্যদের উপদেশ মতে চলতে চেষ্টা আরম্ভ করল। তখন কিন্তু আর ঈসার (আ.) শিক্ষা অবিকৃত নেই। পল তার সুবিধা ও ইচ্ছামত ঈসার (আ.) শিক্ষাকে যোগ-বিয়োগ করে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছেন যে সেটা আর তখন ইহুদিদের অর্থাৎ মুসার (আ.) ধর্মও নয়, কিম্বা মুসার (আ.) ধর্মের বিকৃতি শুধরিয়ে সেটাকে ঈসা (আ.) যে ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন সেটাও নয়, পলের হাতে পড়ে সেটা এক নতুন ধর্মের রূপ নিয়েছে। বর্তমানে খ্রিষ্টান ধর্মের অনেক প-িতরাই বলছেন যে আমরা আজ যে খ্রিষ্টধর্ম দেখি এটাকে খ্রিষ্টধর্ম (Christainity) না বলে পলিয় ধর্ম (Paulinity) বলা উচিত। যা হোক ঐসব কারণে ঈসার (আ.) শিক্ষার ঐ বিকৃত রূপটাকে একটা নতুন নাম দেয়া দরকার হয়ে পড়লো। **মুসার (আ.) ধর্ম অর্থাৎ জুডাই (ইহুদি) ধর্মের গলদ ও বিকৃতি সংস্কার করে সেটাকেই আবার পুনর্জীবন দেবার চেষ্টাকে মূল ইহুদি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে- একটি নতুন ধর্মই সৃষ্টি করা হলো এবং এই নতুন ধর্মের নাম দেয়া হলো খ্রিষ্টধর্ম**। পল কর্তৃক এই যে নতুন নামে নতুন একটি ধর্ম চালু করা হলো এটা কিন্তু ঈসার (আ.) দেশে হলো না, কারণ ইহুদি পুরোহিতরা ঈসা (আ.) ও তাঁর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও তাঁর অনুসারীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। প্যালেস্টাইনে তখন ঈসার (আ.) কোনো অনুসারী নেই, থাকলেও গোপনে, ব্যক্তিগতভাবে। সুতরাং এই নতুন ধর্মের পত্তন করা হলো জেরুসালেম নয়, প্যালেস্টাইনে নয়, বাইরে এন্টিয়ক (Antioch) নগরে (বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট, এক্ট ১১:২৬)। আরও পরিহাসের ব্যাপার হলো এই যে, যে ঈসার (আ.) নামে এই ধর্মের সূত্রপাত করা হলো সেই ঈসা (আ.) তাঁর জীবনেও 'খ্রিষ্টধর্ম' বলে কোনো ধর্মের নামই শোনেন নি।

পল ও তার অনুসারীরা যখন এই নতুন ধর্ম ইউরোপে প্রচার আরম্ভ করলেন তখন ইউরোপীয়ানরা নানা রকম দেব-দেবীর, ভূত-পেত্নীর পূজা করতো। ভূমধ্যসাগরের অপর পারেই ছিল একেশ্বরবাদী জুডাই ধর্ম, অর্থাৎ মুসার (আ.) মাধ্যমে প্রেরিত জীবন-বিধান। কিন্তু তা তারা গ্রহণ করে নি, কারণ ওটা সীমিত ছিল শুধু বনি-ইসরাইলিদের মধ্যে; ইহুদিরাই তাদের ধর্মকে বাইরের কাউকে গ্রহণ করতে দিত না-তারা জানতো যে ও ধর্ম শুধু তাদের গোত্রিয় ধর্ম। যে জন্য ঈসা (আ.) তা

নিজেও অ-ইহুদিদের মধ্যে প্রচার করেন নি, তাঁর শিষ্যদেরও তা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এখন পল যখন ঐ ধর্মের একটা বিকৃত রূপ ইউরোপীয়ানদের সামনে উপস্থাপিত করে তা গ্রহণ করতে বললেন তখন তারা দেখলো যে ঐ বিকৃত রূপটাও তাদের দেব-দেবী, ভূত-পেত্নী পূজার চেয়ে অনেক ভালো, অনেক উন্নত। এছাড়াও অন্যান্য কারণে **পলের এই 'ধর্ম' সম্পূর্ণ ইউরোপে গৃহীত হলো।** ইউরোপে এই ধর্ম সার্বিকভাবে গৃহীত হবার পর এক বুনিয়াদী সমস্যা দেখা দিলো। মুসা (আ.) ছিলেন বনি ইসরাইলিদের জন্য জীবন-বিধান অর্থাৎ দীনের বাহক, যে দীন শরিয়াহ অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবনের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, আইন-কানুন, দ-বিধি ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত জীবনের আত্মশুদ্ধির-প্রক্রিয়ার ভারসাম্যযুক্ত (ওয়াসাতা) ব্যবস্থা। ঐ দীনের আত্মার দিকটাকে পরিত্যাগ করে ওটার শরিয়াতের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সেটাকেই পালন করার আতিশয্যকেই ধর্ম পালন মনে করার বিরুদ্ধে প্রেরিত হলেন ঈসা (আ.)। তিনি বললেন- আমি মুসার (আ.) শরিয়াহ (Law of Moses) বাতিল করতে প্রেরিত হই নি, বরং সেটাকে সত্যায়ন, স্বীকৃতি দিতে এসেছি। কিন্তু তোমরা যে আত্মার দিকটাকে পরিত্যাগ করেছ সেটাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। সুতরাং ঈসার (আ.) শিক্ষার মধ্যে বিন্দুমাত্র জাতীয় শরিয়াহ নেই, আছে শুধু ব্যক্তিগতভাবে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া। পল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রচারে ইউরোপ এই একতরফা, ভারসাম্যহীন ধর্ম গ্রহণ করলো ও তা তাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলো। কারণ পেছনে বলে এসেছি যে, মানুষ কখনই সার্বভৌমত্ব নিজের হাতে নিয়ে আইন-কানুন তৈরি করে- সেই মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন যাপনের চেষ্টা করে নি। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে ইউরোপ **খ্রিষ্টধর্মমতেই সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করলো।** রোমে আসীন পোপ সমগ্র ইউরোপের জীবন-ব্যবস্থার পথ নির্দেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

আইন-কানুন, দ-বিধি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতিহীন একটি ব্যবস্থা দিয়ে একটি সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা অসম্ভব এটা সাধারণ জ্ঞান। অথচ পোপ ও ইউরোপীয় রাজারা সেই ব্যর্থ চেষ্টাই করলেন কারণ ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ বাদ দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেরা সার্বভৌম হয়ে নতুন সংবিধান, আইন-কানুন, দ-বিধি প্রণয়ন করে নেয়া তখনও মানুষের কাছে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ছিল। এই চেষ্টা করতে যেয়ে প্রতিপদে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের ব্যাপারে সংঘাত আরম্ভ হলো এবং ক্রমশ তা এক প্রকট সমস্যারূপে দেখা দিলো। এই সংঘাতের দীর্ঘ ও বিস্তৃত বিবরণে না যেয়ে শুধু এটুকু বললেই চলবে যে এই সংঘাত এক সময়ে এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছালো যে ইউরোপীয় রাজা ও সমাজ নেতাদের সামনে দু'টো পথ খোলা রইলো- হয় এই ধর্ম বা জীবন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে, আর নইলে এটাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ পরিধির সীমাবদ্ধতার মধ্যে, যেখান থেকে এটা রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকা- কোনো প্রভাব বিস্তার না

করতে পারে। যেহেতু ধর্মকে মানুষের সার্বিক জীবন থেকে বিদায় দেয়া অর্থাৎ সমস্ত ইউরোপের মানুষকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়া সম্ভব নয়, তাই শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজ নেতারা দ্বিতীয় পথটাকে গ্রহণ করলেন এবং **অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজ অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্মকে মানুষের সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হলো, দাজ্জালের জন্ম হলো।** ইংল্যান্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খ্রিষ্টান জগৎ এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগে বাধ্য হলো। এর পর থেকে খ্রিষ্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দ-বিধি, এক কথায় জাতীয় জীবনে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার আর কোনো কর্তৃত্ব রইলো না। এর পর ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা ক্রমেই বস্তুবাদী (Materialistic) হয়ে পড়তে শুরু করলো। এটা একটা পরিহাস (Irony) যে, যে জাতির সকল লোক এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করলো যে ধর্মের মূলমন্ত্রই হচ্ছে আত্মশুদ্ধি, কেউ এক গালে চড় দিলে তাকে অন্য গাল পেতে দাও, জোর করে গায়ের কোট খুলে নিলে তাকে আলখেল্লাটাও দিয়ে দাও, সেই জাতি একটি কঠোর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দেবে। কিন্তু তাই হলো কারণ পেছনে যেমন বলে এসেছি, সমষ্টিগতভাবে মানুষ যেটা গ্রহণ ও প্রয়োগ করে সেটার প্রভাবই প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়, ব্যক্তি সেখানে গৌণ ও দুর্বল হয়ে যায়। খ্রিষ্টধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসিত করে আশা করা যেত যে জাতীয় জীবনে ধর্মের মূল্যবোধ বিসর্জন দিলেও ব্যক্তি জীবনে ধর্মের প্রভাবে মানুষ পাপ ও অপরাধহীন হবে- কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাও হলো না, যে কোনো পরিসংখ্যান বলে দেবে যে পাশ্চাত্যে, খুন, জখম, ডাকাতি, হাইজ্যাক, বোমাবাজি, ধর্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদি প্রতিদিন ধাই ধাই করে বাড়ছে। কারণ সমষ্টিগত বৃহত্তর জীবনের চাপে ব্যক্তি তার নিজস্ব চরিত্র বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না। বিশেষ করে যদি জাতীয় জীবনের আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি মানুষের তৈরি করা অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ হয়। সমষ্টিগত জীবনে এই বস্তুবাদ নিয়ে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা গত ৪৮১ বছরে ক্রমে ক্রমে যান্ত্রিক প্রযুক্তিগত বিজ্ঞান চর্চা করে প্রচ- শক্তিশালী হয়ে উঠলো ও বর্তমানে এই শক্তিবলে সমস্ত পৃথিবীর কর্মকা- নিয়ন্ত্রণ করছে। **দাজ্জাল এখন পূর্ণবয়স্ক, যুবক।**

দাজ্জালের অর্থাৎ জুডিও খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতার আবির্ভাব মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার মধ্যে সর্ববৃহৎ ঘটনা, নুহের (আ.) সময়ের মহাপ্লাবনে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবার চেয়েও বড় ঘটনা এই জন্য যে, আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ, তাঁর খলিফা সৃষ্টি করেছিলেন- অর্থাৎ পরীক্ষা করে দেখা যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট এই সৃষ্টিটি তার স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধান, দীন মোতাবেক জীবন যাপন করে, নাকি সে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অপব্যবহার করে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের জীবন-বিধান নিজেই তৈরি করে সেই মোতাবেক তার সমষ্টিগত জীবন যাপন করে। আদম (আ.) থেকে শুরু করে চিরদিন স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার

করে চলার পর ইহুদিদের জুডাই ধর্মের সংস্কারের ঈসার (আ.) প্রচেষ্টার বিকৃত রূপটাকে ইউরোপের সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগের ব্যর্থতার ফলে যখন ঐ দীনকে সমষ্টিগত জীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হলো তখন মানবের সমষ্টিগত জীবনে প্রথমবারের মতো স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করা হলো। **এই প্রথম ইবলিস মানুষকে, বনি-আদমকে তওহীদ থেকে, সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে** (যে সেরাতুল মুস্তাকীমের ওপর ওঁৎ পেতে বসে থেকে সে আল্লাহর খলিফা বনি আদমের ওপর আক্রমণ চালাবে বলে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল; (সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৬, ১৭)) **দীনুল কাইয়্যেমা অর্থাৎ সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে সমর্থ হলো**। এটা আদম, আল্লাহর খলিফা, প্রতিনিধি সৃষ্টি করার মৌলিক প্রশ্ন, আল্লাহকে দেয়া ইবলিসের চ্যালেঞ্জের মৌলিক প্রশ্ন, এই চ্যালেঞ্জে এটাই ইবলিসের প্রথম বিজয় তাই দাজ্জালের জন্ম ও আবির্ভাব আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দুই ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **নুহ (আ.) থেকে শুরু করে আল্লাহর এমন কোনো নবী হন নি যিনি তাঁর উম্মাহকে, অনুসারীদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করে যান নি। আমিও তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করছি।** [আবু ওবায়দা বিন যাররাহ (রা.) থেকে তিরমিযি, আবু দাউদ]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, দাজ্জালের আবির্ভাব মানবজাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ঘটনা হবার কথায় মহানবী বললেন, **আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত,** কিন্তু সতর্কবাণী দেবার কথায় বললেন, আদমের (আ.) বহু পরে **নুহ (আ.) থেকে তাঁর পরবর্তী নবীদের** ও তাঁদের উম্মাহদের। অর্থাৎ আদম (আ.) থেকে নুহের (আ.) আগে পর্যন্ত যে সব নবী-রসুল (আ.) এসেছেন তারা তাঁদের উম্মাহদের দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন নি। ধরে নেয়া যায় যে, প্রয়োজন ছিল না, নইলে তারা অবশ্যই তা করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে নুহের (আ.) আগে পর্যন্ত দাজ্জাল সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করার প্রয়োজন কেন ছিল না এবং নুহের (আ.) সময় থেকে সেটার প্রয়োজন কেন আরম্ভ হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহই জানেন, তবে আমি যা বুঝি তা হচ্ছে এই যে, মানবজাতির ইতিহাসকে দুইটি প্রধান ভাগে বা পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটি আদম (আ.) থেকে নুহের (আ.) ঠিক আগে পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি নুহ (আ.) থেকে শুরু করে আজও চলছে। নুহের (আ.) সময়ে মহাপ্লাবন হয়ে মানুষসহ সমস্ত পৃথিবীর প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেয়ে নুহ (আ.) থেকে মানবজাতি আবার আরম্ভ হওয়ায় নুহের (আ.) এক নাম আদমে সানী অর্থাৎ দ্বিতীয় আদম। নুহ (আ.) থেকে বনি আদমের, মানুষ জাতির জীবনের, ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়, পর্ব আরম্ভ হলো। কোর'আনে আমরা আদমের (আ.) পর থেকে নুহ (আ.) পর্যন্ত কোনো নবী-রসুলের নাম পাই না।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ঐ সময়ের মধ্যে কোনো নবী রসুল আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠান নি; অবশ্যই তিনি পাঠিয়েছেন এবং বহু সংখ্যায় পাঠিয়েছেন। কারণ এক লাখ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রসুলের মধ্যে কোর'আনে আমরা নাম পাই মাত্র জনাত্রিশেক। বাকিরা কোথায়? কবে এসেছেন? কোর'আনে আল্লাহও বলেছেন- **আমি পৃথিবীর প্রতি জনপদে, লোকালয়ে আমার নবী পাঠিয়েছি** (সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭, সুরা নাহল, আয়াত ৩৬, সুরা রা'দ, আয়াত ৭)। এও বলেছেন- তাদের (পূর্ববর্তী নবীরসুলদের) **কতকের সম্বন্ধে তোমাকে [মোহাম্মদকে (দ.)] জানালাম, কতকের সম্বন্ধে জানালাম না** (সুরা মো'মেন, আয়াত ৭৮)। এই যে মাত্র ত্রিশ জনের মতো নবী-রসুলদের নাম আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে আমাদের জানালেন, তারা সবাই নুহের (আ.) পর, তাঁর আগের নয়। তার মানে নুহের (আ.) আগে মানবজাতির মধ্যে বিরাট সংখ্যার নবী-রসুল প্রেরিত হয়েছেন যাদের নাম এবং কে পৃথিবীর কোথায়, কোন্ জাতি, কোন্ জনপদে প্রেরিত হয়েছেন তা আমাদের জানা নেই।

হিন্দু শাস্ত্রে (প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বলে কোনো ধর্ম বা হিন্দু শাস্ত্র বলে কোনো শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতায়, পুরাণে কোথাও হিন্দু শব্দই নেই। শব্দটি এশিয়া মাইনর, খুব সম্ভব তুর্কী দেশ থেকে এসেছে সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। উপমহাদেশে প্রচলিত এই ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম, কোর'আনে যেটাকে বলা হয়েছে দীনুল কাইয়্যেমা, শাশ্বত, চিরন্তন ধর্ম, অর্থাৎ তওহীদ (সুরা রূম, আয়াত ৪৩, সুরা বাইয়্যেনা, আয়াত ৫))। মানবজাতির জীবনের আয়ুষ্কালকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং ভাগগুলিকে এক একটি যুগ বলা হয়েছে। প্রথম যুগের নাম সত্য যুগ, দ্বিতীয় যুগের নাম ত্রেতা যুগ, তৃতীয় যুগের নাম দ্বাপর যুগ ও চতুর্থ যুগের নাম কলি যুগ এবং তার পরই অর্থাৎ কলি যুগ শেষ হলেই মহাপ্রলয় অর্থাৎ কেয়ামত হয়ে মানুষ, পৃথিবী সবই শেষ হয়ে যাবে। ঐ ধর্মমতে সত্যযুগে সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ হলে শতকরা একশ' বারই সত্য জয়ী হতো, মিথ্যা পরাজিত হতো; ত্রেতা যুগে সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ হলে শতকরা পঞ্চাশবার সত্য জয়ী এবং শতকরা পঞ্চাশবার মিথ্যা জয়ী হতো, দ্বাপর যুগে ঐ রকম সংঘর্ষ হলে মিথ্যা শতকরা পঁচাত্তর বার জয়ী, সত্য পঁচিশবার জয়ী ও শেষ কলিযুগে সত্য-মিথ্যার সংঘর্ষে মিথ্যা শতকরা একশ' বারই জয়ী ও সত্য একশ' বারই পরাজিত হবে। এটা একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার যে, হিন্দু ধর্মের আবাসভূমি এই ভারত উপমহাদেশ থেকে বহু দূরে গ্রীক ও রোমানদের প্রাচীন ধর্মেও মানবজাতির আয়ুষ্কালকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি স্বর্ণ যুগ, দ্বিতীয়টি রৌপ্য যুগ, তৃতীয়টি তাম্র যুগ ও শেষটি লৌহ যুগ। মোটামুটি হিন্দু ধর্মের বিভাগের অনুরূপ। ইসলাম ধর্মে ঠিক অমন পরিষ্কার যুগ বিভাগ না থাকলেও বর্তমান সময় যে শেষ যুগ অর্থাৎ আখেরী যামানা তা সর্বত্র গৃহীত এবং মহানবীর বিভিন্ন হাদিস দিয়ে সমর্থিত। সনাতন ধর্মমতে সত্য যুগে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর, ত্রেতা যুগে দশ হাজার বছর, দ্বাপরে দুই হাজার এবং কলি যুগে অর্থাৎ বর্তমানে একশ'

বিশ বছর। মনে হয় এটা গড়পড়তা আয়ু ছিল না, ঊর্ধতম আয়ু ছিল কারণ বর্তমান কলি যুগে মানুষ ঊর্ধতম একশ' বিশ বছরের মতো বাঁচে দেখা যাচ্ছে।

যা হোক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে নুহ (আ.) কোন্ যুগের নবী ছিলেন? কতকগুলি কারণ থেকে আমার মনে হয় তিনি দ্বাপর যুগে জন্মেছিলেন। কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন- নুহ নয়শ' পঞ্চাশ বছর তাঁর জাতির মধ্যে ছিলেন (সুরা আনকাবুত, আয়াত ১৪)। আল্লাহ এখানে শব্দ ব্যবহার করেছেন 'নাকেশ' অর্থাৎ তাঁর জাতির মধ্যে ছিলেন। এখানে স্পষ্ট নয় যে নুহ (আ.) তাঁর জাতির মধ্যে মোট সাড়ে নয়শ' বছর ছিলেন, নাকি নবুয়াত পাবার পর সাড়ে নয়শ' বছর তাঁর জাতির মধ্যে তওহীদ প্রচার করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যদি ধরে নেই যে, তিনি তওহীদ প্রচার করেছেন সাড়ে নয়শ' বছর তবে অন্তত আরও চার পাঁচশ' বছর ওর সাথে যোগ করতে হবে, কারণ অবশ্যই তিনি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নবুয়াত পান নি, একটা পরিণত বয়সে পেয়েছেন; অর্থাৎ এই দাঁড়ায় যে, মহাপ্লাবনের সময় তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দশ' বা পনেরশ' বছর। তারপর মহাপ্লাবনের পর তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের মাঝেও তিনি বেশ কিছুকাল বেঁচেছিলেন। অর্থাৎ মোট দু'হাজার বছরের কাছাকাছি। আর যদি ধরে নেই যে, তিনি তাঁর জাতির মধ্যে মোট সাড়ে নয়শ' বছর ছিলেন এবং তারপর মহাপ্লাবন হলো, তাহলেও তিনি প্লাবনোত্তর যে সময়টা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কাটালেন সেটা যদি তিন, চার বা পাঁচশ' বছর হয়ে থাকে তা হলেও সেই দু'হাজার বছরের কাছাকাছিই যাচ্ছে। দ্বাপর যুগের মানুষের ঊর্ধতম আয়ু ছিল দেড় দু'হাজার বছর। তাই আমি নুহকে (আ.) দ্বাপর যুগের নবী মনে করি।

এবার আসা যাক দাজ্জালের আবির্ভাবের ও সে সম্বন্ধে সতর্কীকরণের কাজ নুহ (আ.) থেকে আরম্ভ হবার কারণে। এর কারণ হলো সত্য ও ত্রেতা যুগে দাজ্জালের জন্মের সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধে সত্য যুগে শতকরা একশ' বার ও ত্রেতা যুগে শতকরা পঞ্চাশ বারই সত্যের যেখানে জয় হতো সেখানে দাজ্জালের জন্মের সম্ভাবনা (Potentiality) ছিল না। কারণ মূলত দাজ্জাল হচ্ছে চাকচিক্যময় প্রতারক যাকে আল্লাহর রসুল কায্যাব অর্থাৎ মিথ্যা, মিথ্যাবাদী বলে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দ্বাপর যুগে অর্থাৎ নুহের (আ.) সময় থেকে আরম্ভ হলো দাজ্জালের মতো একটি মিথ্যার আবির্ভাবের সম্ভাবনা, কারণ এই যুগে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে জয় পরাজয়ের অনুপাত হয়ে দাঁড়ালো শতকরা পঁচাত্তর বার মিথ্যার জয়। তাই নুহ (আ.) থেকেই আরম্ভ হলো প্রত্যেক নবীর দাজ্জালের আবির্ভাব সম্বন্ধে সতর্কবাণী, যদিও প্রকৃতপক্ষে দাজ্জালের জন্ম হবে ঘোর কলিযুগে, বর্তমানে, তবুও যেহেতু শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মিথ্যার জয়ের সময় আরম্ভ হলো দ্বাপর যুগ থেকে, কাজেই তখন থেকেই নবী রসুলদের সতর্কবাণীও শুরু হলো।

বিশ্বনবীর যেসব হাদিসে আমরা দাজ্জালের বন্দী হয়ে থাকার ও যথাসময়ে প্রকাশ হবার কথা পাই সেগুলির প্রকৃত অর্থ এটাই; তখনকার দিনের মানুষকে রূপক অর্থে বলা। কোনো অজানা দ্বীপে দাজ্জাল শৃঙ্খলিত হয়ে থাকাটা তার ঐ সম্ভাবনার

(Potentiality) কথাই রূপকভাবে বর্ণিত। আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ মানবজাতির সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধানবাণী আদমের (আ.) অনেক পরে নুহ (আ.) থেকে আরম্ভ কেন হলো তার কারণ এই। অর্থাৎ নুহের (আ.) আগে সত্য ও ত্রেতা যুগে দাজ্জালের মতো এতবড় মিথ্যার প্রকাশ ও তার পৃথিবীকে পদানত করার কোনো সম্ভাবনা (Potentiality) ছিল না।

এখানে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত ইবনে সাইয়াদ (রা.) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন, কারণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে না পেরে একে অনর্থক অতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এমনকি মেশকাতে একটি পুরো অধ্যায়ই ইবনে সাইয়াদের ওপর দেয়া হয়েছে, অথচ এটা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়।

ব্যাপারটা এই: বিশ্বনবীর সময় মদীনায় এক ইহুদি পরিবারে এক শিশু জন্ম নেয়। শিশুটি বোধহয় কিছুটা অস্বাভাবিক ছিল, কারণ এ খবর মহানবীর কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে দেখতে যান। কিন্তু একে সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল বলে আল্লাহর রসুল অবশ্যই মনে করেন নি। যেখানে তিনি জানেন যে, প্রকৃত দাজ্জাল তাঁর বহু পরে মাহদী (আ.) ও ঈসার (আ.) সময় আবির্ভূত হবে এবং ঈসার (আ.) হাতে ধ্বংস হবে সেখানে তিনি তাঁর নিজের পবিত্র উপস্থিতির সময় মদীনায় কাউকে সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল বলে মনে করবেন কেমন করে? তাছাড়া তিনি তো নিজেই বলেছেন যে দাজ্জাল মক্কায় এবং মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না (বুখারী এবং মুসলিম) অথচ ইবনে সাইয়াদ (রা.) জন্মেছেনই মদীনায় এবং মক্কাতেও গেছেন হজ করতে। তাছাড়া ইবনে সাইয়াদ (রা.) মুসলিম হয়েছিলেন এবং তার দাজ্জাল হওয়ার সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন- আল্লাহর রসুল কি বলেন নি যে, দাজ্জালের কোনো সন্তান হবে না, অথচ আমার সন্তান আছে; তিনি কি বলেন নি যে, দাজ্জাল কাফের হবে আর আমি মুসলিম (হাদিস- আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে মুসলিম)। মোট কথা মদীনার আবু সাইয়াদ (রা.) দাজ্জাল ছিলেন না এবং তার দাজ্জাল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। যে ঈসার (আ.) হাতে মৃত্যুর কথা বিশ্বনবী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সেই ঈসার (আ.) বহু পূর্বেই ইবনে সাইয়াদের (রা.) স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কখনো কখনো আল্লাহর রসুল নবুয়াতের মিথ্যা দাবিদার ও অত্যাচারী শাসকদের দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তা আখেরী যামানার সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল নয় যার সম্বন্ধে নবী রসুলরা মানবজাতিকে সতর্ক ও সাবধান করে এসেছেন। অথচ বুঝতে না পেরে ইবনে সাইয়াদকে (রা.) সেই প্রকৃত দাজ্জাল বলে চিহ্নিত করার চেষ্টায় হাদিসে একটি পুরো অধ্যায়ই যোগ করা হয়েছে। **আমি এর কোনো গুরুত্ব দেই না, কারণ প্রকৃত দাজ্জালকে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দয়ায় চিহ্নিত করতে পেরেছি।**

বিশ্বনবীর সময় মানুষ যে বর্তমানের জুডিও-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার মতো আত্মাহীন একটি মহাশক্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে অসমর্থ ছিল, যে জন্য তাঁকে এ

সম্বন্ধে রূপক (Alligorically) বর্ণনা করতে হয়েছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ইবনে সাইয়াদের (রা.) ঘটনা ও ওটাকে এত গুরুত্ব দেয়া।

তিন ॥

আল্লাহর রসুল দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। [আয়েশা (রা.) থেকে বুখারী]

এই হাদিসটিকে আমি দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য হাদিস বলে মনে করি। কারণ লক্ষ্য করতে হবে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় কে চাইছেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সমগ্র মানবজাতির পথ প্রদর্শক, আল্লাহর কয়েক লক্ষ নবী-রসুলের (আ.) নেতা, মাকামে মাহ্‌মুদায় যে একটি মাত্র মানুষকে আল্লাহ স্থান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মানুষ জাতির মুকুটমণি মোহাম্মদ বিন আবদ আল্লাহ (দ.)। এই মানুষ যখন কোনো ফেতনা অর্থাৎ বিপদ, সংকট, অশান্তি, গোলযোগ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন তবে সে ফেতনা কত বড় ফেতনা সেটা বোঝাবার জন্য যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন করে না। এখানে আমি আবার বলছি, আল্লাহর রসুল দাজ্জালের আবির্ভাবকে যে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন **আমাদের আলেম বলে পরিচিত শ্রেণিটি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও দেননি। যে ভয়াবহ ফেতনা থেকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে, রবুবিয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে সমস্ত মানব জাতিকে দিয়ে নিজেকে রব, প্রভু বলে স্বীকার করিয়েছে, সেই দাজ্জালের চেয়ে এই শ্রেণির কাছে দাড়ি, টুপি এবং অন্যান্য অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি অনেক বেশি প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ**। কারণও আছে। আকিদার বিকৃতির জন্য এই দীনুল ইসলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, এর অস্তিত্বের কারণ এদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেয়ে অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ্য এসে স্থান করে নিয়েছে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও বিকৃত হয়ে গেছে। তাই তাদের কাছে প্রকৃত তওহীদ ও তওহীদ প্রতিষ্ঠার জেহাদের চেয়ে দাড়ি, টুপি, মোছ, পাজামার গুরুত্ব বেশী। এদের অগ্রাধিকারের ধারণা (আকিদা) সেই প্রতিবেশীদের মতো যারা কপালে ডাকাতের গুলি লেগে নিহত গৃহস্বামীর মৃতদেহ দেখে বলেছিলেন- ইস! অল্পের জন্য চোখটা বেঁচে গেছে। যাক, এখানে ও বিষয় আলোচনার নয়, এখানে শুধু দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা (এ বিষয়ে পাঠকের কৌতুহল হলে তাকে আমার লেখা "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইটি পড়তে অনুরোধ করছি)। আল্লাহর কাছে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বিশ্বনবীর আশ্রয় প্রার্থনা বুঝিয়ে দেয় যে, দাজ্জালের আবির্ভাব কত বড় ঘটনা।

দাজ্জালের পরিচিতি

দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা বলার পর আল্লাহর রসুল তার সম্বন্ধে বেশ কতকগুলি চিহ্ন বলে গেছেন যাতে তাঁর উম্মাহ্ দাজ্জালকে দাজ্জাল বলে চিনতে পারে ও সতর্ক হয়, তাকে গ্রহণ না করে এবং তার বিরোধিতা করে, তাকে প্রতিরোধ করে। এগুলো একটা একটা করে পেশ করছি। এক দিক দিয়ে বইয়ের এই অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দাজ্জালকে দাজ্জাল বলে আমরা যদি চিনতেই না পারি তবে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা বহু বেশি হয়ে যায়। এ অনেকটা এমন যে শত্রু যদি বন্ধু সেজে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমরা তাকে শত্রু বলে না চিনি তবে বিপদের ঝুঁকি কত বেশি হয়ে যায়। এ জন্যই বোধহয় আল্লাহর রসুল দাজ্জালকে যাতে আমরা সহজেই চিনতে পারি সেজন্য অনেকগুলি চিহ্ন বলে গেছেন। কিন্তু ঐসঙ্গে এ কথাও বলে গেছেন যে প্রকৃত মো'মেন ছাড়া, মহাপণ্ডিত হলেও দাজ্জালকে দাজ্জাল বলে চিনতে পারবে না, যদিও দাজ্জালের কপালে "কাফের" শব্দটি লেখা থাকবে। আর মো'মেন নিরক্ষর হলেও দাজ্জালকে দাজ্জাল বলে চিনতে পারবে (এই অধ্যায়েরই ১১ নং হাদিস)।

এক ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জাল ইহুদি জাতির মধ্যে থেকে উত্থিত হবে এবং ইহুদি ও মোনাফেকরা তার অনুসারী হবে।** [ইবনে হানবাল (রা.) থেকে মুসলিম]

এই হাদিসটির বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না কারণ বর্তমানের জড়বাদী (Materialistic) সভ্যতা যে ইহুদি জাতি থেকে জন্মেছে তা দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের এক নম্বর হাদিসেই বিশ্লেষণ করেছি। তাছাড়া এই সভ্যতার প্রচলিত নামই হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা (Judeo-Christian Technological Civilization)। নামকরণেই বংশ পরিচয় স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা যে এর অনুসারী হবে তা তো স্বাভাবিক কিন্তু মহানবী যে মোনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত করলেন তার অর্থ হচ্ছে এই যে, মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিটি প্রায় সম্পূর্ণটাই দাজ্জালকে তার দাবি মোতাবেক রব অর্থাৎ প্রভু বলে মেনে নেবে এবং নিয়েছে। মোনাফেকদের সংজ্ঞা অর্থাৎ 'মুখে এক কথা বলা আর কাজে অন্যটা করা' অনুযায়ী এরা মোনাফেকের পর্যায়ে পড়ে। নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে, নামায, রোযা, হজ, যাকাহ ও নানাবিধ ইবাদত করেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করে

দাজ্জালের শেখানো মানুষের সার্বভৌমত্বকে জাতীয় জীবনে স্বীকার করে নেয়া যদি মোনাফেকী না হয় তবে আর মোনাফেকী কি?

দুই ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব, প্রভু বলে ঘোষণা করবে এবং মানবজাতিকে বলবে তাকে রব বলে স্বীকার করে নিতে।** (বুখারী)

দাজ্জালের এই দাবি "আমাকে প্রভু বলে স্বীকার করো" এর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে এই যে দাজ্জাল পৃথিবীর মানুষকে বলবে যে, আমি মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থা দিচ্ছি, যে আইন-কানুন, দ-বিধি, শিক্ষা-ব্যবস্থা দিচ্ছি তা তোমরা গ্রহণ ও প্রয়োগ করো। তোমরা বহু পুরাতন বেদ, মনু-সংহিতা ও কোর'আন-হাদিস নিঃসৃত যে আইন-কানুন, অর্থনীতি, দ-বিধি ইত্যাদি জীবনে প্রয়োগ করছিলে তা পুরানো, অচল ও বর্বর; ওগুলো ত্যাগ করে আমি যে অতি আধুনিক আইন-কানুন দিচ্ছি তা গ্রহণ করো ও তোমাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগ করো। তা হলে তোমরা আমাদের মতো সভ্য হবে, সমৃদ্ধিশালী, ধনী ও শক্তিশালী হবে। তোমাদের জীবন যাত্রার মান আমাদের মতো উন্নত হবে। আমরা যেমন স্বর্গসুখে আছি তোমরাও এমনি স্বর্গসুখ ভোগ করবে। দাজ্জাল রব, প্রভু হবার দাবি করছে কিন্তু স্রষ্টা হবার দাবি করছে না। পাশ্চাত্যের ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা ও শক্তি ঠিক এই প্রভুত্বের, রবুবিয়াতের দাবিই করছে, মানুষের স্রষ্টা হবার দাবি করছে না। **সে বলছে ব্যক্তিগত জীবনে তোমরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, জৈন, বৌদ্ধ যা থাকতে চাও থাকো এবং যত খুশি তোমাদের আল্লাহকে, ঈশ্বরকে, গডকে, এলীকে ডাকো। যত খুশি নামাজ পড়ো, রোযা করো, হজ করো, প্রার্থনা করো আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে আমার রবুবিয়াহ, প্রভুত্ব মেনে নাও।** এখানে তোমাদের স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান করে আমি যে জনগণের, একনায়কের, কোনো বিশেষ শ্রেণির, সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থাৎ এক কথায় মানুষের সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি করেছি, তার যে কোনো একটাকে মেনে নাও।

আজ মানবজাতি দাজ্জালের ঐ দাবি মেনে নিয়েছে এবং মেনে নেয়ায় দাজ্জাল মানবজাতিকে তার কাছে যে জান্নাতের মতো জিনিসটি আছে তাতে প্রবেশ করিয়েছে। তাই আজ সমস্ত মানবজাতি জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে। সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। একটি মাত্র দম্পতি থেকে সৃষ্ট হয়েও, একটিমাত্র জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও (সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩; সুরা ইউনুস, আয়াত ১৯; সুরা নেসা, আয়াত ১) মানুষ একে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে, আগুনে পুড়িয়ে মারছে, তাদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নারীদের ধর্ষণ করছে। দাজ্জালের অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে মানুষের মধ্যে কেউ

কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হয়ে জঘন্য বিলাস-ব্যাসনের মধে ডুবে আছে আর কেউ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, খেতে পরতে দিতে না পেরে নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চা সন্তানদের হত্যা করে নিজেরা আত্মহত্যা করছে, মা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করছে, পেটের সন্তান অন্যের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে; আল্লাহর দেয়া দ-বিধি প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জালের দ-বিধি গ্রহণ করায় সর্বরকম অপরাধ চুরিডাকাতি, হাইজ্যাক, অপহরণ, ছিনতাই, খুনজখম, ধর্ষণ প্রতি দেশে, প্রতি জাতিতে ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে চলেছে; আল্লাহর দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ত্যাগ করে দাজ্জালের দেয়া আত্মাহীন, আল্লাহহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মানুষ তার নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে।

সাজদা অর্থ আত্মসমর্পণ, কাউকে সাজদা করার অর্থ তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তার আদেশ নির্দেশ মেনে চলা- তাই আল্লাহ তাঁকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা নিষেধ করেছেন। কিন্তু মুসলিমসহ সমস্ত মানবজাতি আজ দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে সিজদায় পড়ে আছে। এক কথায় ইবলিস মানবজাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থেকে, তওহীদ থেকে বিচ্যুত করে তাকে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় পতিত করার যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহকে দিয়েছিল আজ তাতে সে সক্ষম হয়েছে, আজ সে জয়ী অবস্থায় আছে।

তিন ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের বাহনের দুই কানের মধ্যে দূরত্ব হবে সত্তর হাত**। [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

আরবী ভাষায় সত্তর বলতে সাতের পিঠে শুন্য দিলে যেমন ৭০ বোঝায় তেমনি এর আরও একটা ব্যবহার আছে। সেটা হলো কোনো সংখ্যাকে বহু বা অসংখ্য বোঝাবার জন্যও ঐ সত্তর সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। এটা শুধু ঐ সত্তর সংখ্যা দিয়েই করা হয়, অন্য কোনো সংখ্যা, যেমন পঞ্চাশ বা একশ' দিয়ে করা হয় না। এই হাদিসটায় বিশ্বনবী দাজ্জাল যে বিশাল, বিরাট কিছু এই কথাটা রূপকের মাধ্যমে বলেছেন। বাহনের দুই কানের মধ্যকার দূরত্ব বহু হাত হলে, বাহনটা কত বড় এবং তাহলে সেই বাহনের আরোহী কত বড়। এই প্রসঙ্গে এখানে আরেকটি হাদিস পেশ করতে চাই। এ হাদিসটি আমি ছাত্রজীবনে ভারতের মধ্যপ্রদেশের একজন বড় আলেমের কাছ থেকে শুনেছিলাম। তখন ওটার উৎস লিখে রাখি নি এবং এখন আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। হাদিসটি হলো, আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের ঘোড়ার বা গাধার (বাহনের) এক পা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে, অন্য পা পশ্চিমপ্রান্তে হবে**। এ হাদিসটি আমি সহিহ বলে বিশ্বাস করি, কারণ ওপরে আবু হোরায়রার (রা.)

ঐ হাদিসটির এটি পরিপূরক ও একার্থবোধক। দু'টোরই অর্থ দাজ্জাল ও তার বাহন উভয়ই বিরাট, বিশাল ও পৃথিবীব্যাপী।

বর্তমানে পৃথিবীতে ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার চেয়ে বড়, এর চেয়ে শক্তিধর কিছুই নেই, এ কথায় কেউ দ্বিমত করতে পারবেন না, এটা সন্দেহাতীত সত্য। এই শক্তির কাছে সমস্ত পৃথিবী নতজানু হয়ে আছে, এর পায়ে সিজদায় পড়ে আছে। কারো সাধ্য নেই এই সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বা একে প্রতিরোধ করার। **আরোহী দাজ্জাল হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা আর তার ঘোড়া বা বাহন হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত যন্ত্র** (Scientific Technology)। এই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত যন্ত্রই হচ্ছে এর মহাশক্তি। এই সভ্যতার যন্ত্র আজ পৃথিবীর সর্বত্র। এ এত শক্তিশালী যে এর পারমাণবিক অস্ত্র (Nuclear weapons) আজ এই পৃথিবীকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। বিশ্বনবীর রূপক বর্ণনার শাব্দিক অর্থ নিয়ে যারা বিরাট এক ঘোড়ায় উপবিষ্ট একচক্ষু এক দানবের অপেক্ষায় আছেন, এই দুইটি হাদিসই তাদের ভুল ধারণা শোধরাবার জন্য যথেষ্ট মনে করি। দুই কানের মধ্যে শত শত বা হাজার হাজার হাত দূরত্ব বা পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই পা, এমন বাহন কি সম্ভব বা বাস্তব? এটা নড়াচড়া করবে কোথায়? এরপরও যারা ঐ ধারণা নিয়ে থাকবেন তারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ধারণার (আকিদার) দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

চার ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত। সে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো আকাশ দিয়ে উড়ে চলবে।** [নাওয়াস বিন সা'মান (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযি]

এই হাদিসের বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। দাজ্জাল অর্থাৎ পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার তৈরি এরোপ্লেন যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায় তখন যে সেটাকে বায়ুতাড়িত অর্থাৎ জোর বাতাসে চালিত মেঘের টুকরোর মতো দেখায় তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি?

পাঁচ ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে।** [নাওয়াস বিন সা'মান (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযি]

বর্তমান ইহুদি খ্রিষ্টান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (Scientific Technology) আকাশে হালকা মেঘের ওপর এরোপ্লেন দিয়ে রাসায়নিক পদার্থ (Chemicals) ছিটিয়ে বৃষ্টি নামাতে পারে এ কথা তথ্যাভিজ্ঞ প্রত্যেক লোকই জানেন। পৃথিবীর বিভিন স্থানে ঐ প্রক্রিয়ায় কৃষি কাজের জন্য বৃষ্টি নামানো হচ্ছে।

সন্দেহ হলে যে কোনো আবহাওয়া বিজ্ঞানীর (Meterologist) বা কৃষিবিদের (Agriculturist) কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

ছয় ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের গরু-গাভী, মহিষ, বকরি, ভেড়া, মেষ, ইত্যাদি বড় বড় আকারের হবে এবং সেগুলোর স্তনের বোটা বড় বড় হবে (যা থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ হবে)**। [নাওয়াস বিন সা'মান (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযি]।

তথ্যাভিজ্ঞ প্রতিটি লোকই জানেন যে ইউরোপ, আমেরিকার অর্থাৎ পাশ্চাত জগতের Cattle অর্থাৎ গরু মহিষ, বকরী ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর আকার বাকি দুনিয়ার ঐসব গৃহপালিত পশুর চেয়ে অনেক বড়, কোনো কোনোটা একেবারে দ্বিগুণ এবং ওগুলো প্রাচ্যের পশুগুলির চেয়ে চারপাঁচ গুণ বেশি দুধ দেয়। ও দু'টোই ওরা সম্ভব করেছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে।

সাত ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জাল মাটির নিচের সম্পদকে আদেশ করবে ওপরে উঠে আসার জন্য এবং সম্পদগুলি ওপরে উঠে আসবে এবং দাজ্জালের অনুসরণ করবে**। [নাওয়াস বিন সা'মান (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযি]

দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার জন্মের আগে ভূগর্ভস্থ অর্থাৎ মাটির গভীর নীচের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল। মাটির সামান্য নিচের কিছু কিছু সম্পদ মানুষ কখনো কখনো আহরণ করতে পারতো। এই সভ্যতার সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উন্নতির ফলে দাজ্জাল মাটির গভীর নীচ থেকে, এমনকি সমুদ্রের তলদেশ থেকে তেল, গ্যাস ইত্যাদি নানা রকমের খনিজ সম্পদ ওপরে উঠিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে ও পৃথিবীময় তা ওঠাচ্ছে। এটাকেই মহানবী বলেছেন যে, দাজ্জালের আদেশে মাটির নিচের সম্পদ ওপরে উঠে আসবে। তারপর ঐ সম্পদ দাজ্জালকে অনুসরণ করবে তার অর্থ হলো এই যে, মাটির নিচ থেকে ওপরে উঠে আসার পর দাজ্জাল তা পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে, যেখানে ইচ্ছা পাঠাবে, ঐ সম্পদ দাজ্জালের যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, জাহাজ, গাড়ী, যুদ্ধের যানবাহন ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে ব্যবহার করবে। আজ বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়িত হয়েছে।

আট ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। সেখান থেকে সে যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। যারা তার বিরোধিতা করবে তাদের সে ঐ ভাণ্ডার থেকে রেযেক দেবে না। এইভাবে সে মুসলিমদের অত্যন্ত কষ্ট দেবে। যারা দাজ্জালকে অনুসরণ করবে তারা আরামে থাকবে আর যারা তা করবে না তারা কষ্টে থাকবে।** [বুখারী ও মুসলিম]

এখানে প্রথমেই পরিষ্কার করে নেয়া দরকার যে রেযেক শব্দের অর্থ শুধু খাদ্যদ্রব্য নয় । রেযেক বলতে খাদ্যদ্রব্য, বাড়ী-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া, টাকা-পয়সা সবই বোঝায় । এক কথায় পার্থিব সম্পদ বলতে যা বোঝায় তা সবই রেযেক । দাজ্জালের কাছে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে যে রেযেকের বিপুল ভা-ার আছে এ কথা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই । পৃথিবীর সম্পদের সিংহভাগই তাদের দখলে । এই সম্পদ থেকে দাজ্জাল কাদের দেয়? শুধু তাদের দেয় যারা তাকে মেনে নিয়েছে, তাকে স্বীকার করেছে, স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধান ত্যাগ করে দাজ্জালের সৃষ্ট তন্ত্রমন্ত্র, বাদ, নীতি গ্রহণ করেছে । যারা দাজ্জালকে প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জাল তাদের দেয় না, যদিও আজ দাজ্জালকে প্রত্যাখ্যান করার প্রায় কেউ নেই । সমস্ত পৃথিবীতে তার একক আধিপত্য ও প্রভুত্ব বিরাজ করছে ।

আজ যদি কোনো দেশ, জাতি বা জনগোষ্ঠী দাজ্জালকে অস্বীকার করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে ও কোর'আন হাদিসের ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে তবে কি হবে? নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার কাছ থেকে শুধু সর্বপ্রকার সাহায্যই বন্ধ হয়ে যাবে না, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের বিরোধিতা আরম্ভ হয়ে যাবে । **এ বিরোধিতা শুধু দাজ্জাল নয়, দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে দাজ্জালের পায়ে সিজদায় অবনত অন্যান্য জাতিগুলির মানুষও, যার মধ্যে 'মুসলিম' নামধারীরাও আছেন, তাদের কাছ থেকেও আসবে।** পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভাবক ইহুদি খ্রিষ্টান জগতের বাইরে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি ও দেশ দাজ্জালের মুখাপেক্ষী, তার কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে যারা দাজ্জালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমষ্টিগত ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের সে ভিক্ষা ও ঋণ দিয়ে কৃতার্থ করছে, বাঁচিয়ে রাখছে । দাজ্জাল ভিক্ষা না দিলে তারা না খেয়ে থাকে, দাজ্জাল ঋণ না দিলে তাদের সরকার অচল হয়ে যায়, সমস্ত উন্নয়নমূলক (দাজ্জালের দৃষ্টিতে উন্নয়নমূলক) কর্মকা- বন্ধ হয়ে যায় । পৃথিবীর যে কোনো দেশ বা জাতি দাজ্জালের একটু অবাধ্যতা করলেই তাকে সব রকম সাহায্য দেয়া বন্ধ (Economic Sanction) করে দেয়, তার ওপর অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক অবরোধ (Embargo) স্থাপন করে । জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল (Consortium) ইত্যাদি, এক কথায় দাজ্জালের অধীনে যত কিছু

আছে তার কোনো কিছু থেকেই কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বর্তমানে দাজ্জাল যে Sanction ও Embargo আরোপ করে তার অবাধ্য জাতিগুলিকে শাস্তি দিয়ে বশে আনতে চেষ্টা করে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রসুল ঠিক সেটাই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন- শুধু আক্ষরিকভাবে ঐ Sanction ও Embargo শব্দ দু'টি ব্যবহার না করে।

নয় ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে**। [আব্দুলাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম]

দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হবে অর্থ সে ডান চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না, যা দেখবে সবই বাঁ চোখ দিয়ে। আল্লাহ যা কিছু তৈরি করেছেন সব কিছুরই দু'টো বিপরীত দিক আছে। এই মহাসৃষ্টিও দৃশ্য ও অদৃশ্য, কঠিন ও বায়বীয়, আলো ও অন্ধকার, আগুন ও পানি, দিন ও রাত্রি ইত্যাদি বিপরীত জিনিসের ভারসাম্যযুক্ত মিশ্রণ। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁর যে খলিফা পাঠালেন সেই মানুষের জন্যও তিনি নির্ধারিত করলেন বিপরীতমুখী বিষয়। তার জন্যও তিনি নির্দিষ্ট করলেন দেহ ও আত্মা, জড় ও আধ্যাত্মিক, সত্য ও মিথ্যা, সওয়াব ও গোনাহ, ভালো ও মন্দ, ইহকাল ও পরকালের ভারসাম্যযুক্ত সমন্বয়। এই দুইয়ের ভারসাম্যই হচ্ছে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। তাঁর এই খলিফার জন্য যে দীন, জীবন-বিধান তিনি তাঁর নবী রসুলের মাধ্যমে প্রেরণ করলেন সেটার এক নাম দীনুল ফিতরাহ, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক জীবন-ব্যবস্থা এবং সেই দীন যারা মেনে চলবে আল্লাহ তাদের নাম দিলেন মিল্লাতান ওয়াসাতা, ভারসাম্যযুক্ত জাতি (সুরা বাকারা, আয়াত ১৪৩)। এই ভারসাম্যের দু'দিকের যে কোনো দিককে বাদ দিলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে ও অস্বাভাবিক অপ্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহ তাঁর খলিফা, মানুষ সৃষ্টি করে যে পরীক্ষা করতে চান তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পথভ্রষ্ট বনি-ইসরাইল জাতিকে হেদায়াত করার জন্য প্রেরিত আল্লাহর নবী ঈসার (আ.) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তাঁর শিক্ষাকে ইউরোপের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করলো। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবিহীন একটা ভারসাম্যহীন ব্যবস্থা, যেটার উদ্দেশ্যই ছিল শুধু আত্মশুদ্ধির পরিত্যক্ত প্রক্রিয়াকে (তরিকা) পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেটা মানুষের সার্বিক জীবনে অচল এটা সাধারণ জ্ঞানেই (Common sense) বোঝা যায়। এই অচল ব্যবস্থাকে চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইউরোপ যখন মানুষের সমষ্টিগত জীবনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সংবিধান, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, আইন-কানুন, দ-বিধি তৈরি করে নিলো তখন তারা জীবনের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললো। দু'চোখ দিয়ে না দেখে এক

চোখ অন্ধ করে শুধু এক চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করলো। অন্ধ করলো ডান অর্থাৎ দক্ষিণ চোখটাকে।

ডান এবং বামের মধ্যে ডানকে নেয়া হয় উত্তম ও বামকে নেয় হয় অধম হিসাবে। কেয়ামতের দিন জান্নাতিদের আমলনামা, তাদের কাজের রেকর্ড বই দেয়া হবে ডান হাতে, জাহান্নামীদের দেয়া হবে বাম হাতে (সুরা হাক্কাহ্, আয়াত ১৯, ২৫ ও সুরা ইনশিকাক, আয়াত ৭)। দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মা ডান দেহ বাম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সত্য ডান মিথ্যা বাম, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে পরকাল ডান, ইহকাল বাম, জড় ও আধ্যাত্মের মধ্যে আধ্যাত্ম ডান, জড় বাম ইত্যাদি। **ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার (Judeo-Christian Materialistic Civilization) ডান চোখ অন্ধ অর্থাৎ জীবনের ভারসাম্যের একটা দিক, আত্মার দিক, পরকালের দিক, অদৃশ্যের (গায়েব) দিক, সত্যের দিক সে দেখতে পায় না,** তার সমস্ত কর্মকা- জীবনের শুধু একটা দিক নিয়ে, দেহের দিক, জড় ও বস্তুর দিক, যন্ত্র ও যন্ত্রের প্রযুক্তির দিক, ইহকালের দিক, কারণ শুধু বাম চোখ দিয়ে সে জীবনের ঐ একটা দিকই দেখতে পায়। তাই বিশ্বনবী বলেছেন, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে। এই ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে তার বাঁ চোখ দিয়ে এই মহাবিশ্ব, এই বিশাল সৃষ্টিকে দেখতে পায়। কিন্তু তার ডান চোখ অন্ধ বলে এই সৃষ্টির স্রষ্টাকে দেখতে পায় না; অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল মহাকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু যে এক অলঙ্ঘনীয় বিধানে বাঁধা আছে তা দাজ্জাল তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু ডান চোখ নেই বলে এই মহাবিধানের বিধাতাকে দেখতে পায় না। শিশুর জন্মের আগেই মায়ের বুকে তার খাবারের ব্যবস্থা করা আছে তা দাজ্জালের চিকিৎসা বিজ্ঞান তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু যিনি এ ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই মহাব্যবস্থাপককে সে দেখতে পায় না, কারণ তার ডান চোখ অন্ধ।

দশ ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর সে যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা তোমাদের জন্য জান্নাত হবে।** [আবু হোরায়রা (রা.) এবং আবু হোযায়ফা (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম]

খ্রিষ্টধর্ম মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা ব্যর্থ হওয়ার পর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে মানুষের হাতে তুলে নেবার পর সংবিধান, আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরি করে মানব জীবন পরিচালনা আরম্ভ হলো, যার নাম দেয়া হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular Democracy)। এই গণতন্ত্রের

সার্বভৌমত্ব রইলো মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে। অর্থাৎ মানুষ তার সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধান ও সেই সংবিধান নিঃসৃত আইন-কানুন প্রণয়ন করবে **শতকরা ৫১** জন বা তার বেশী। যেহেতু মানুষকে আল্লাহ সামান্য জ্ঞানই দিয়েছেন সেহেতু সে এমন সংবিধান, আইন-কানুন দ-বিধি, অর্থনীতি তৈরি করতে পারে না যা নিখুঁত, নির্ভুল ও ত্রুটিহীন, যা মানুষের মধ্যকার সমস্ত অন্যায়, অবিচার দূর করে মানুষকে প্রকৃত শান্তি (ইসলাম) দিতে পারে। কাজেই ইউরোপের মানুষের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল আইন-কানুনের ফলে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অন্যায় ও অবিচার প্রকট হয়ে উঠলো। বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করায় সেখানে চরম অবিচার ও অন্যায় আরম্ভ হয়ে গেলো। মুষ্টিমেয় মানুষ ধনকুবের হয়ে সীমাহীন প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে গেলো আর অধিকাংশ মানুষ শোষিত হয়ে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নেমে গেলো। স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ অর্থনৈতিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানুষের এক অংশ বিদ্রোহ করলো ও গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করলো। ইউরোপের মানুষের অন্য একটা অংশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যান্য দিকের ব্যর্থতা দেখে সেটা বাদ দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো। অর্থাৎ **গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এগুলো সবই অন্ধকারে হাতড়ানো, এক ব্যবস্থার ব্যর্থতায় অন্য নতুন আরেকটি ব্যবস্থা তৈরি করা**। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিগত জীবনের ধর্মহীনতা অবলম্বন করার পর থেকে যত তন্ত্র (-cracy), যত বাদই (-ism) চালু করার চেষ্টা ইউরোপের মানুষ করেছে সবগুলির সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে রয়েছে। অর্থাৎ **রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, এসবগুলিই মানুষের সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন ধাপ, বিভিন্ন পর্যায় (Phase, step) মাত্র। এই সবগুলি তন্ত্র বা বাদের সমষ্টিই হচ্ছে এই ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা, দাজ্জাল।**

এই দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা পৃথিবীর মানবজাতিকে বলছে মানুষের সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রণালীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের তৈরি করা সংবিধান, সেই সংবিধানের ওপর ভিত্তি করা মানুষের তৈরি করা আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আধুনিক। তোমরা এই ব্যবস্থা মেনে নাও, গ্রহণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গসুখে বাস করবে, তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান এমন উন্নীত হবে, এমন ভোগবিলাসে বাস করতে পারবে যে তা জান্নাতের সুখের সমান। আর যদি আমাদের এই নীতি তোমরা গ্রহণ না করো, তবে তোমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধা অশিক্ষার মধ্যে জাহান্নামের কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। যারা দাজ্জালের কথায় বিশ্বাস করে ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন জীবন-ব্যবস্থা মেনে নেবে তাদের সে গ্রহণ করে তার জান্নাতে স্থান দেবে, তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি

সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। আর যারা দাজ্জালের জীবন-ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের সে তার বিরাট ধন ভা-ার থেকে কোনো অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে না, তাদের সে রাজনৈতিক, সামরিকভাবে বিরোধিতা করবে অর্থাৎ সে তাদের তার জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

দাজ্জাল যে মানবজাতিকে উপরোক্ত কথা বলছে তা নির্দিষ্ট ঘটনাবলী দিয়ে প্রমাণ করার দরকার করে না। পাশ্চাত্যের সমস্ত প্রচার যন্ত্রগুলি এই কথা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, স্থুল ও সুক্ষ্মভাবে বলে যাচ্ছে যে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদ অন্তর্ভুক্ত), তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে ধনতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত), তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা (যেটা সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী, বস্তুবাদী, যেখানে আত্মার শিক্ষার কোনো স্থান নেই), তাদের সামাজিক ব্যবস্থা (যেখানে অবৈধ যৌন কর্মকা- সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে গৃহীত, যেখানে সমকামিতা আইনসঙ্গত), তাদের তৈরি করা দ-বিধি সবই সর্বোত্তম, প্রগতিশীল, আধুনিক। ওর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না। ওর বাইরে যত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাব্যবস্থা আছে সব গোঁড়া, পশ্চাদমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে ও হাস্যকর ব্যবস্থা। আল্লাহর রসুল বলেছেন- যারা দাজ্জালের জীবন-ব্যবস্থা স্বীকার করে নেবার ফলে দাজ্জালের জান্নাতে স্থান পাবে তারা দেখবে প্রকৃতপক্ষে তা জাহান্নাম। আর যারা দাজ্জালকে অস্বীকার করার দরুন তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে দেখবে তারা জান্নাতে আছে। আল্লাহর রসুলের কথা সত্য কিনা যাচাই করে দেখা যাক। এই যাচাইয়ের সময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে **গণতন্ত্র থেকে ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে সাম্যবাদ (Communism) পর্যন্ত পৌঁছলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্রটা মিলিয়ে একটাই বিষয় ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা, দাজ্জাল এবং দাজ্জালের মৃদু থেকে উগ্রতম রূপ।** অন্যভাবে বলা যায় জন্ম থেকে দাজ্জালের ক্রমে ক্রমে বড় হওয়া।

দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সভ্যতা, জীবন-ব্যবস্থা এই প্রচারণায় বিশ্বাস করে যে জনসমষ্টি, জাতি বা দেশ তা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ দাজ্জালের জান্নাতে, স্বর্গে প্রবেশ করেছে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতারিত হয়ে প্রবেশ করার পর অতি শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা আসলে জাহান্নামে, নরকে প্রবেশ করেছে। কথাটা ভালো করে বোঝার জন্য দাজ্জালের উগ্রতম রূপ সাম্যবাদ (কমিউনিজমকে) বিবেচনায় নেয়া যাক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনে-এ কথা লক্ষ কোটি বার বলা হয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে, দেশে থাকা স্বর্গের সুখে থাকার সমান। যারা ঐ দেশগুলোর রেডিও মোটামুটি নিয়মিতভাবে শুনে এসেছেন তাদের এ কথা বলে দেবার দরকার নেই। এখানে লক্ষণীয় যে, তারা তাদের সমাজটাকে সর্বদাই স্বর্গ (Paradise)

বলে বাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদ গ্রহণ করে স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং বিশ্বনবী ঠিক ঐ জান্নাত অর্থাৎ Paradise শব্দটাই ব্যবহার করেছেন। দাজ্জালের স্বর্গ Paradise যদি সত্যই স্বর্গ হয়ে থাকে তবে যারা সেখানে প্রবেশ করবে তারা নিশ্চয়ই আর কখনই সেখান থেকে বের হয়ে আসার চিন্তাও করবে না, এ কথা তো আর মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি হয়েছে? কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকরী করার কিছু পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে শাসকরা যেটুকু খবর বাইরে যেতে দিতো তার বেশি আর কোনো খবর বাকি পৃথিবীর কেউ পেত না। এই বিচ্ছিন্নতা অতি শিগ্‌গিরই এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছলো যে বাকি দুনিয়ায় এর নাম হয়ে গেলো Iron Curtain, লোহার পর্দা। এ পর্দা এমন দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ালো যে, বিরাট দেশটার সাধারণ সড়ক বা বিমান দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত বাকি দুনিয়ার মানুষ জানতে পারতো না। পরবর্তীতে যখন চীন ঐ জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করলো, দাজ্জালকে রব স্বীকার করে দাজ্জালের উগ্রতম পর্যায় সাম্যবাদী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করলো তখন সেখানেও সেই একই ব্যাপার দাঁড়ালো, চীন বাকি দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো এবং এর নাম হয়ে গেলো Bamboo Curtain, বাঁশের পর্দা।

এই দুই বিরাট দেশের শাসকরা এই বিচ্ছিন্নতার নীতি কেন গ্রহণ করলেন? **একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে কোনো দেশ জাতি বা সমাজ যদি স্বর্গে পরিণত হয় তবে তো সেই জাতির শাসকদের ঠিক উল্টো করা উচিত**। পর্দা দেবার বদলে তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল সমস্ত দ্বার খুলে দেয়া; বাকি পৃথিবীকে বলা যে- দ্যাখো! আমরা বলছি আমরা স্বর্গসুখে আছি এ কথা সত্য কিনা। তাদের কর্তব্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে বলা যে, **আমরা পাসপোর্ট প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এ স্বর্গ ছেড়ে যদি কোথাও যেতে চাও যাও, কোনো বাধা দেবো না। তাদের কর্তব্য ছিল বাকি পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলা- আমরা ভিসা প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এসে দেখে যাও আমরা জান্নাতে (Paradise) আছি কিনা**। পরবর্তীতে ঠিক ঐ ব্যাপার চীনেও হলো। সাম্যবাদ, কমিউনিজমের জন্মের পর থেকে এই সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত কমিউনিষ্ট দেশগুলি যে নিজেদের বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তাদের জনগণের সাথে বাইরের পৃথিবীর জনগণের সামান্যতম সংযোগ ছিল না এ কথা কোনো তথ্যাভিজ্ঞ (Informed) মানুষই অস্বীকার করতে পারবেন না, এটা ঐতিহাসিক সত্য। ঐ দেশগুলির বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযোগ ছিল শুধুমাত্র ওপরের তলার শাসকদের সঙ্গে, আর কারো সঙ্গে নয়।

শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ব্যাপারেই নয়, যখনই যে দেশ দাজ্জালের উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার স্বর্গে প্রবেশ করেছে, তখনই

সে দেশকে সোভিয়েত ও চীনের মতো বাকি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয়েছে।

'স্বর্গে' প্রবেশ করেও ঐ উল্টো নীতি গ্রহণ করা ছাড়া ঐ সব দেশের শাসকদের আর কোনো নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তার কারণ হলো এই যে, স্বর্গের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেই স্বর্গে প্রবেশ করার পর সেসব দেশের জনসাধারণ অতি শীঘ্রই বুঝতে পারলো যে এ তো স্বর্গ নয়, এ তো নরক। কিন্তু তখন বেশি দেরি হয়ে গেছে। তবুও তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলো ঐ স্বর্গ থেকে বের হয়ে আসার জন্য। সহজ কথা নয়, কারণ ও স্বর্গ থেকে বের হবার অর্থ নিজেদের দেশ, লক্ষ স্মৃতি জড়ানো প্রিয় জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে, অচেনা সমাজে বাস করা, যাদের ভাষা পর্যন্ত তাদের অজানা। কিন্তু অনস্বীকার্য ইতিহাস এই যে ঐসব দেশের জনসাধারণ তাদের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে অজানা দেশে চলে যাবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই চেষ্টায় তারা পরিবারের অন্যদের প্রাণও বিপন্ন করেছে, সহায়-সম্পদ বিসর্জন তো ছোট কথা।

কমিউনিষ্ট পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে লোক পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে রাশিয়ানরা বিখ্যাত বা কুখ্যাত বার্লিন দেয়াল তৈরি করলো। তবুও মানুষ পালানো বন্ধ করা যায় না দেখে দেয়ালের ওপর প্রতি পঞ্চাশ গজ অন্তর স্তম্ভ (ডধঃপয ঃড়বিৎ) তৈরি করে সেখানে মেশিনগান বসানো হলো। হুকুম দেয়া হলো কাউকে দেয়াল টপকে পালাতে দেখলেই গুলী করে হত্যা করতে। তবু লোক পালানো বন্ধ হয় না দেখে পরিখা খোড়া হলো, কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হলো ও নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বসানো হলো পলায়নকারীদের খুঁজে বের করে হত্যা বা বন্দী করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই 'স্বর্গ' থেকে পালানো বন্ধ করা গেলো না। ঐ সময়ের খবরের কাগজ যারা নিয়মিত পড়েছেন, রেডিও শুনেছেন তাদের কাছে 'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় গ্রেফতার, গুলী করে হত্যা ইত্যাদি দৈনন্দিন খবর ছিল। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত ২৭ লাখ নর-নারী, শিশু কমিউনিষ্ট স্বর্গ থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং ঐ সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ ঐ পালাবার চেষ্টায় নিহত হয়, বন্দী হয়।

'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় বহু লোক সফল হয়েছে, বহু লোক বিফল হয়েছে, বন্দী হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে। শাসকরা পালানোটা প্রায় অসম্ভব করে তোলার পর মানুষ মরিয়া হয়ে বিকল্প পথ ধরলো। একদল বেলুনে চড়ে রাশিয়ার সীমান্ত পার হলো, অনেকে নদী ও পরিখা সাঁতরে পার হলো, অবশ্য পরিখাগুলি সাঁতরে পার হতে যেয়ে অনেকে গুলী খেয়ে মারা পড়লো। দু'টি পরিবার এক অভিনব পন্থায় পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে এসে সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ হয়ে পূর্ব জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন একটি কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হওয়ার পর রেল লাইনগুলিকে নতুন সীমান্তে দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলে। ঐ দু'টি পরিবার অতি কৌশল ও চেষ্টায় একটি

রেলওয়ে ইঞ্জিন যোগাড় করে। তারপর ঐ দুই পরিবারের নারী ও শিশুদের তাতে উঠিয়ে পুরুষরা তীব্রগতিতে ঐ ইঞ্জিনটি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে পশ্চিম জার্মানীতে চলে আসে। আরও বিভিন্ন উপায়ে বহু নারী-পুরুষ শিশু তাদের প্রিয় জন্মভূমি, দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সমস্তের মায়া ত্যাগ করে প্রাণ হাতে নিয়ে একদিন যেটাকে স্বর্গ ভেবেছিল তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারেই নয়, যে জনসমষ্টিই ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের স্বর্গে প্রবেশ করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেটাকে গ্রহণ করেছে, তারা অচিরেই বুঝতে পেরেছে যে, তারা নরককে স্বর্গ মনে করে তাতে প্রবেশ করেছে।

চীনেও ঐ একই ব্যাপার হয়েছে। মোহভঙ্গের পর হাজার হাজার চীনা তাদের দেশ থেকে বাইরের জগতে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় প্রাণ হারিয়েছে, বন্দী হয়েছে। মূল চীন ভূখ- থেকে সমুদ্র প্রণালী সাঁতরে পার হয়ে ব্রিটিশ শাসিত হংকং-এ পালিয়ে যাবার চেষ্টায় বহু চীনা ডুবে মারা গেছে। যুদ্ধে আমেরিকানরা হেরে যাবার পর সম্পূর্ণ ভিয়েতনাম কমিউনিষ্টদের হাতে চলে যাবার পর সে দেশ থেকে মানুষ পালানোর যে বিরাট হিড়িক পড়ে গিয়েছিল ও তা বহু বছর পর্যন্ত চলেছে সে খবর জানা নেই এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। ছোট বড় নৌকা বোঝাই করে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ মানুষ সমুদ্রে ভেসেছে। তারা কোথায় পৌঁছবে, কোন্ দেশে আশ্রয় পাবে কিছুই না জেনেও তারা **শুধু দাজ্জালের 'স্বর্গ' থেকে পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে যে নৌকায় একশ' জনের স্থান হবে সে নৌকায় পাঁচ সাতশ' মানুষ ভর্তি হয়ে সমুদ্রে ভেসেছে।** হাজার হাজার নৌকা জোর বাতাসে, ঝড়ে ডুবে গেছে, হাজার হাজার নৌকা জলদস্যুরা (Pirates) আক্রমণ করে লুটে নিয়েছে, মানুষদের হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, তাদের বিদেশে বিক্রি করে দিয়েছে।

এ সমস্ত খবর হাজার হাজার বার সমস্ত পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, বহু ছবি ওগুলিতে ছাপা হয়েছে। সেই সব লোমহর্ষক খবর পড়ে, ছবি দেখে পৃথিবীর মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছে। এতো সংখ্যায় এতো বার এই পালানোর চেষ্টা হয়েছে যে এদের জন্য একটা আলাদা শব্দই সৃষ্টি হয়েছে- The Boat People - নৌকার মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এখন এদের এই নামেই উল্লেখ করে। ভিয়েতনামেও এসব খবর পৌঁছেছে, কিন্তু তাতেও ঐ স্বর্গের অধিবাসীদের ফেরাতে পারে নি। তারপরও তারা স্ত্রী পুরুষ, নারী ও শিশুদের দিয়ে নৌকা অতিরিক্ত বোঝাই করে প্রাণ হাতে নিয়ে অজানা সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এমন একটাও দেশ নেই যেখানে 'স্বর্গ' থেকে পলায়নকারী আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য বড় বড় শিবির (Camp) খুলতে না হয়েছে। এই সেদিন হংকং- এর আশ্রয় শিবির থেকে লোকজনকে ভিয়েতনামের 'স্বর্গে' ফেরত পাঠাবার চেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে হংকং পুলিশের যে তুমুল সংঘর্ষ হয়ে গেলো, যাতে পুলিশসহ 'স্বর্গের' ভূতপূর্ব বাসিন্দাদের কয়েকজন মারা গেলো সে

সংবাদ ও ছবি আমাদের দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রেই ছাপা হয়েছিল (এটি নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের অর্থাৎ বইটি প্রথমবার প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পূর্বের ঘটনা)। ঐ একই অবস্থা প্রতিটি সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশের। কমিউনিষ্ট কিউবার একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অস্থায়ীভাবে বাস করছে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে।

দাজ্জালের ঘোষিত জান্নাত যে সেটার অধিবাসীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমার মনে হয় করিয়ার যুদ্ধের একটি ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর করিয়া দেশটি দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ করিয়া এবং এ ভাগ আজও আছে। দু'টোই দাজ্জালের পূজারী। শুধু তফাৎ হচ্ছে এই যে দক্ষিণ করিয়া দাজ্জালের পূর্বতন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আছে আর উত্তর করিয়া দাজ্জালের উগ্রতর পর্যায়ের সাম্যবাদী একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার অধীনে আছে।

১৯৫২ সালে এই দুই করিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলো। উত্তর করিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এলো কমিউনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন আর দক্ষিণ করিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এলো জাতিসংঘের (United Nations) অধীনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেকগুলো অ-কমিউনিস্ট দেশ। যুদ্ধ চললো তিন বছর। তারপর সন্ধি হলো। সন্ধির অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হলো যুদ্ধবন্দী বিনিময়। এ বিনিময়ের শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হলো এই যে, কোনো পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যারা নিজেদের ইচ্ছায় তাদের দেশে ফিরে যেতে চাইবে শুধু তাদেরই ফেরত পাঠানো যাবে। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হয়ে যাবার পর দেখা গেলো যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উত্তর করিয়ার অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের হাতে অ-কমিউনিস্টদের অর্থাৎ আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের ১২,৭৬০ (বার হাজার সাতশ' ষাট) জন যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ৩৪৭ (তিনশ' সাতচলিশ) জন ফিরে আসতে অস্বীকার করলো, অর্থাৎ তারা কমিউনিস্ট দেশেই থেকে গেলো। এদের মধ্যে ২১ (একুশ) জন আমেরিকানও ছিল।

অপরদিকে জাতিসংঘের অধীনে দেশগুলোর অর্থাৎ অ-কমিউনিস্টদের হাতে কমিউনিস্টদের ৭৫,৭৯৭ (পঁচাত্তর হাজার সাতশ' সাতানব্বই) জন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করলো ৪৮,৮১৪ (আটচলিশ হাজার আটশ' চৌদ্দ) জন। এত বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী তাদের নিজ দেশে ফেরত না যাওয়ায় জাতিসংঘ এক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। পরে এদের ফিলিপাইনে, ফরমোসা ও অন্যান্য স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। যাদের মনে এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসবে তারা কোরিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস, ব্রিটিশ বিশ্বজ্ঞান কোষ (Encyclopedia Britannica) দেখে নিতে পারেন বা সরাসরি জাতিসংঘে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন।

এই ঘটনার পর আর কোনো সন্দেহ কি থাকতে পারে যে কমিউনিস্টদের **বহু ঘোষিত 'স্বর্গ' (Paradise) প্রকৃতপক্ষে সেটার অধিবাসীদের জন্য নরক?** ওটা যদি নরক নাও হয়ে শুধু বাইরের দুনিয়ার অর্থাৎ অ-কমিউনিস্ট দেশ ও জাতিগুলোর অবস্থার মতো হতো তবে ঐ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীরা সকলেই অবশ্যই তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যেতো। কারণ উভয় স্থানের অবস্থা সমান বা মোটামুটি সমান হলেও একদিকের পালায় রয়েছে তাদের প্রিয় দেশ, জন্মভূমি, বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, শৈশবের স্মৃতি জড়ানো বাসস্থান। ঐ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে যদি হাজার হাজার মানুষ অজানা দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকির সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে নিশ্চিতই বলা যায় যে, ঐ লোকগুলো তাদের দেশকে জাহান্নাম বা নরক বলে বিশ্বাস করে। ফেরত না যাওয়া ঐ সংখ্যা থেকেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যে ২৬,৯৮৩ (প্রায় সাতাশ হাজার) যুদ্ধবন্দী নিজেদের কমিউনিস্ট দেশে ফিরে গেলো তারা ফিরে গেছে দাজ্জালের স্বর্গের জন্য নয়, গেছে তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বাপ-মা'র, বন্ধু-বান্ধবের, আত্মার সাথে জড়ানো, মায়া মমতায় ঘেরা জন্মভূমিকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে না পেরে। ঐগুলোর মায়া ত্যাগ করতে না পেরে তারা জেনে-শুনেই নরকই বেছে নিয়েছে। **সন্ধির শর্তের মধ্যে যদি এই শর্তও যোগ করা হতো যে, যেসব যুদ্ধবন্দী স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যাবে না তাদের পরিবারকেও এনে তাদের কাছে দেয়া হবে তবে এ সাতাশ হাজারের মধ্যে সাতশ' জনও ফিরে যেতো কিনা সন্দেহ আছে।**

এখন প্রশ্ন হলো- এ কী রকম 'স্বর্গ' যে স্বর্গের অধিবাসীরা সেখান থেকে পালানোর জন্য প্রাণ হাতে নেয়, সমুদ্র সাঁতরে পার হবার চেষ্টায় ডুবে মরে, ছোট ছোট নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করে, ইলেকট্রিক কাঁটা তারের শক খেয়ে মরে, 'স্বর্গরক্ষীদের' গুলী খেয়ে মরে এবং শত্রুর হাতে বন্দী হলে জন্মভূমি, স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করে আবার 'স্বর্গে' ফিরে যেতে অস্বীকার করে! এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে। সেটা হলো- তবে কি যেসব দেশ কমিউনিজম গ্রহণ করেছে শুধু সেইসব দেশ জাহান্নামের মত, আর যে সব দেশ করে নি সেগুলো জান্নাতের মত? না, তা নয়। আমি পেছনে বলে এসেছি যে- জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামরিক, আর্থ-সামাজিক ইত্যাদি কোনো বিষয়েই খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো নির্দেশনা, এমনকি বক্তব্য পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও ওটাকে সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগের চেষ্টায় অবধারিত ব্যর্থতা **যখন ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম দিলো, স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে এলো তখনই দাজ্জালের জন্ম হলো।**

তারপর জন্মের পর যেমন কোনো প্রাণী ক্রমে বড় হয়, তার জীবনে একটার পর একটা ধাপ বা পর্ব আসে, তেমনি দাজ্জালের জীবনেও ধাপ, পর্ব (Phase) এসেছে। প্রথমে গণতন্ত্র ও তার অপূর্ণতা ও ত্রুটির কারণে উদয় হয়েছে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)। ধনতন্ত্রের কুফল ও অবিচারের ফলে এসেছে সমাজতন্ত্র ও তার উগ্রতর রূপ সাম্যবাদ, কমিউনিজম। সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন

পর্যায়ের, ধাপের অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জোট বেঁধে একনায়কতন্ত্রকে ধ্বংস করলো। কিন্তু তার পরপরই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠা-া লড়াই (Cold war) শুরু হয়ে গেলো। এই ঠা-া লড়াই করিয়ায়, ভিয়েতনাম ও আরও ছোট খাটো দু'চার জায়গায় প্রকৃত যুদ্ধের (Shooting war) রূপ নিলেও ব্যাপক আকারে হয় নি শুধু একটি মাত্র কারণে। সেটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের ও সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের উভয়ের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। উভয়েই জানতো যে এ অস্ত্র ব্যবহার করলে উভয়কেই ধ্বংস হতে হবে। এই পরিস্থিতিই Deterent হিসেবে কাজ করে তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধতে দেয় নি। নিজেদের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করা থেকে উভয়পক্ষকে বিরত রেখেছে। যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই নাম Deterent, দা'তাত। কিন্তু মনে রাখতে হবে **দাজ্জালের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের মতো পর্যায় আসলেও এবং কখনো কখনো ঐ পর্যায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হলেও দাজ্জাল একটিই মহাশক্তিধর আত্মাহীন দানব ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা, Judeo-Christian Materialistic Civilization|**

কাজেই কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার যেসব যুদ্ধবন্দী দেশে ফিরে গেলো না তারা শুধু দাজ্জালের স্বর্গের উগ্রতম অবস্থা থেকে কিছু নম্রতর অবস্থায় ফিরে এলো মাত্র। করিয়ার যুদ্ধোত্তর বন্দী বিনিময় অংকের হিসাব প্রমাণ করে দিয়েছে মহানবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যেটায় তিনি বলছেন দাজ্জালের সঙ্গে একটি জান্নাতের মতো আরেকটি জাহান্নামের মতো জিনিস থাকবে। সে মানবজাতিকে আহ্বান করে বলবে আমাকে তোমরা রব (প্রভু) বলে মেনে নাও (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে আমার সার্বভৌমত্ব মেনে নাও)। যারা তাকে রব বলে মেনে নেবে (ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ করবে) সে তাদের তার জান্নাতে স্থান দেবে এবং সেটা তাদের জন্য জাহান্নাম হবে, আর যারা তাকে রব বলে স্বীকার করবে না সে তাদের তার জাহান্নামে দেবে এবং সেটাই তাদের জন্য জান্নাত হবে। আজ শুধুমাত্র মক্কা ও মদীনা ছাড়া বাকি সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম।

এগারো ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো'মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো'মেন নয়, তারা পড়তে পারবে না**। [আবু হোরায়রা (রা.), আবু হোযায়ফা (রা.) এবং আনাস (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদিসটি শুধু অর্থবহ এবং আকর্ষণীয় নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। মো'মেন হলে লেখাপড়া না জানলেও, নিরক্ষর হলেও তারা পড়তে পারবেন আর মো'মেন না হলে, শিক্ষিত হলেও, প-িত হলেও দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা দেখতে

ও পড়তে পারবেন না, এই কথা থেকেই এটা পরিষ্কার যে, **দাজ্জালের কপালের ঐ লেখা কাফ্, ফে, রে এই অক্ষরগুলো দিয়ে লেখা নয়।** মো'মেনরা নিরক্ষর হলেও ঐ লেখা দেখতে ও পড়তে পারবেন। মো'মেন কারা? আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন- শুধু তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে, তারপর আর তাতে কোনো সন্দেহ করে না, এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে; তারাই হলো খাঁটি (সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)।

এখানে মনে রাখতে হবে যে 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে' এ কথার অর্থ **যারা আল্লাহর সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্বীকার করে না।** দাজ্জালকে রব বলে স্বীকার করে নেয়ায় প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম দুনিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ব্যক্তি জীবনে কোণঠাসা করে রেখে আকিদার (Comprehensive Concept) বিকৃতির কারণে কার্যত মোশরেক ও কাফের হয়ে গেছে। কাজেই বৃহত্তর জীবনে দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা অর্থাৎ দাজ্জাল যে সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী কাফের এটা তারা দেখতেও পান না সুতরাং পড়তেও পারেন না। কিন্তু জীবনের প্রতি অঙ্গনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে যিনি বিশ্বাসী, অর্থাৎ মো'মেন তিনি নিরক্ষর হলেও দাজ্জাল যে কাফের তা দেখতে ও বুঝতে পারেন অর্থাৎ তার কপালে কাফের লেখা পড়তে পারেন।

বিশাল বাহনে (যান্ত্রিক প্রযুক্তি) আসীন দানব বলে দাজ্জালকে (ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা) যেমন রসুলাল্লাহ রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন দাজ্জালের কপালে লেখাও তেমনি রূপক বর্ণনা, অক্ষর দিয়ে লেখা নয়। অন্য হাদিসে বিশ্বনবী বলেছেন- **সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের পদতলে আসবে** (হাদিস- ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর)। পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিটির সামান্য অংশ বাদে সবটাই দাজ্জালকে (ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা) দাজ্জাল বলে চিনতে না পেরে তাকে বন্ধুভাবে নিয়ে তার আদেশ অনুসারে চলবে, তার পায়ে সিজদায় পতিত হবে। মহানবীর কথায় বোঝা যায়, যেহেতু সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণে আসবে সেহেতু এই জাতিটিও দাজ্জালের পদতলে, নিয়ন্ত্রণে আসবে, অর্থাৎ তাকে রব বলে স্বীকার করে নেবে। তাই আমরা দেখি মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিটির প্রায় সমস্ত মানুষ দাজ্জালকে রব বলে স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু ওদিকে মহা-পরহেযগার, মুত্তাকী। এমন কি এই জাতির মধ্যে কয়েকটি দেশ আছে যাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কপালে সাজদার কালো দাগ আছে কিন্তু তারা দাজ্জালের আশ্রয়ে থেকে, দাজ্জালের কাছ থেকে অস্ত্রসহ সবরকম সাহায্য নিয়ে তাদের দেশের মধ্যে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের বন্দী করছেন, নির্যাতন করছেন, গুলী করে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করছেন। এর কারণ এসব নেতাসহ মুসলিমবিশ্ব দাজ্জালের শেখানো এই কথা

বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, সমষ্টিগত নয়, তাই তারা দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা দেখতে ও পড়তে পারেন না।

বারো ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে**। [আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে শারহে সুন্নাহ]

সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেমন দাজ্জালকে প্রভু বলে স্বীকার করে নেবে মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিটিও তেমনি দাজ্জালকে রব বলে স্বীকৃতি দেবে এ কথা পেছনে স্থানে স্থানে বলে এসেছি। এবার রসুলাল্লাহর হাদিস দিয়ে এ কথার প্রমাণ হচ্ছে। পেছনে বলে এসেছি আরবী ভাষায় কোনো কিছু বহু, অসংখ্য, অগণিত বোঝাতে ঐ সত্তর সংখ্যা ব্যবহার হয়। ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতাকে সমস্ত ইহুদিরা যে সমর্থন করবে তার স্বাভাবিক কারণ ওটা তাদেরই সৃষ্টি। তাদের সমর্থনকে বর্ণনা করার সময়ও রসুলাল্লাহ ঐ সত্তর সংখ্যাই ব্যবহার করেছেন, বলেছেন- **সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালকে অনুসরণ করবে** (হাদিস- আনাস (রা.) থেকে মুসলিম)। দু'টো হাদিসেই কি পরিমাণ মানুষ দাজ্জালকে রব বলে মেনে তাকে অনুসরণ করবে তা বলতে যেয়ে বিশ্বনবী ইহুদি এবং তাঁর উম্মাহ অর্থাৎ মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতি, উভয়টার সম্বন্ধেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন- সত্তর হাজার। তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে **ইহুদি খ্রিষ্টানরা যেমন সবাই তাদের নিজেদের সৃষ্ট ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতাকে, দাজ্জালকে রব বলে স্বীকার করে নেবে ঠিক তেমনি মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিটিও তাই নেবে**। প্রকৃত অবস্থাও তাই। আরবের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া সমস্ত মুসলিম বিশ্ব দাজ্জালের, ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার তৈরি রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহর দেয়া আইন, দ-বিধি প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জালের তৈরি আইন দ-বিধি অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বের আদালতগুলোতে বিচার হচ্ছে, শাস্তি দেয়া হচ্ছে। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের, নৈতিকতার আল্লাহর দেয়া মানদ- পরিত্যাগ করে এই জাতি এখন দাজ্জালের দেয়া মানদ- ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে।

দাজ্জালের নাম উল্লেখ না করেও তাকে ইহুদি-খ্রিষ্টান বলে মহানবী কয়েকটি হাদিসে তাঁর উম্মাহর দাজ্জালকে স্বীকার করে নেবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন- **ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পদে পদে অনুসরণ করবে, এমন কি তারা যদি গুইসাপের (সরীসৃপের) গর্তেও প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে সেখানেও প্রবেশ করবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- হে রসুলাল্লাহ!** (যাদের অনুসরণ করা হবে) **তারা কি ইহুদি ও খ্রিষ্টান? তিনি জবাব দিলেন-** (তারা ছাড়া) **আর কারা** (হাদিস- আবদুলাহ বিন আমর (রা.) থেকে তিরমিযি এবং মুয়াবিয়াহ (রা.) থেকে আহমদ ও আবু দাউদ)! অন্য একটি হাদিসে মহানবী বলেছেন- **ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মত ইহুদিদের অনুসরণ**

ও অনুকরণ করতে করতে এমন পর্যায়েও যাবে যে তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে তবে আমার উম্মতের মধ্য থেকে তাও করা হবে (হাদিস- আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম)।

এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলাল্লাহ ইহুদি ও খ্রিষ্টান বলেছেন, দাজ্জাল শব্দটা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু এই বিষয়ে অন্যান্য হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে এবং তাঁর উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালকে অনুসরণ করার হাদিসকে যোগ করলে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, বর্তমান ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা হচ্ছে দাজ্জাল আর মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতি শুধু ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া আর সর্বতোভাবে দাজ্জালকে রব, প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছে, তার পায়ে সিজদায় পড়ে আছে। জাতীয় জীবনে, যেটা আসল জীবন, সেই সমষ্টিগত জীবনের প্রতি বিষয়ে কপালে কাফের লেখা দাজ্জালকে অনুসরণ করেও আকিদার বিকৃতির কারণে নামায, রোযা, ইত্যাদি নানা রকম নিষ্ফল ইবাদত করে যাচ্ছে।

দাজ্জালের আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে জাতীয় জীবন থেকে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসন দেয়াকে অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যারা স্বীকার করে নিয়েও মহা ইবাদতে ব্যস্ত আছেন তারা "জাতীয় জীবনই ইসলামে মুখ্য ও প্রধান, ব্যক্তি জীবন গৌণ", আমার এ অভিমতের বিরোধিতা করবেন তা জানি। এ কথা আমি কোর'আন এবং হাদিস থেকে হাজার বার প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু তা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে শুধু একটা কথা তাদের কাছে পেশ করবো। এই দীনের পাঁচটি ফরদে আইন, অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে চারটিই সমষ্টিগত, জাতিগত, মাত্র একটি ব্যক্তিগত। ঈমান (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) অর্থাৎ তওহীদ, সালাহ (নামায), হজ ও যাকাহ- সব ক'টিই সমষ্টিগত শুধুমাত্র রোযা ব্যক্তিগত। এ জাতির একটি অংশ এমন কি ব্যক্তিগত জীবনেও দাজ্জালকে রব বলে মেনে নিয়েছে।

তেরো ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন করবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মতো তার করায়ত্ত হবে।** [মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর]

বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই (Judeo Christian Technological Civilization) যে দাজ্জাল এ সিদ্ধান্ত যারা অস্বীকার করবেন বা তাতে সন্দেহ করবেন তারা মেহেরবানী করে আমাদের বলে দেবেন কি তাহলে রসুলাল্লাহ তাঁর ঐ হাদিসে কাকে বা কি বোঝাচ্ছেন? সমস্ত পৃথিবীর মাটি ও পানি (Land and Sea) অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটাকে আজ কোন্ মহাশক্তি আচ্ছন্ন করে আছে? তারা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, ঐ শক্তি অবশ্যই পাশ্চাত্যের ঐ ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা। সমস্ত পৃথিবীতে আজ এর শক্তি অপ্রতিরোধ্য। কিছুদিন

আগ পর্যন্তও দাজ্জালের দু'টি প্রধান ভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, আজ নেই, এখন দাজ্জাল নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোনো ভূ-ভাগ, মাটি নেই, কোনো সমুদ্র নেই যেখানে এই মহাশক্তি যা ইচ্ছা তা করতে না পারে। এই হাদিসটিতে বিশ্বনবী যে উপমা দিয়েছেন তা সত্যই প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে- কোনো কিছু দিয়ে (এখানে তিনি চামড়া শব্দ ব্যবহার করেছেন) একটা বস্তুকে (এখানে এই পৃথিবীকে) সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলা, পেঁচিয়ে ফেলা। ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার যান্ত্রিক শক্তি যেভাবে সমস্ত পৃথিবীটাকে পদানত করে রেখেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী। পৃথিবীর ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তা থেকে বলা যায় যে, **অতীতে কখনও পৃথিবীতে এমন একটি মহাশক্তির আবির্ভাব হয় নি যে শক্তি সমস্ত পৃথিবীকে পদানত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে।** এটা সম্ভবও ছিল না। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন ইত্যাদি এমন ছিল না যে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো স্থানের সাথে যোগযোগ করা যায় বা অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে যাওয়া যায়। ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (Scientific Technology) সেটা সম্ভব করেছে। আর করেছে বলেই মানব ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটি মহাশক্তিধর দৈত্য-দানবের আবির্ভাব হয়েছে যেটা সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করেছে।

এক সময় রোমান সাম্রাজ্য পৃথিবীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ শাসন করতো, অন্য সময় পারসিক শক্তি বিরাট এলাকার অধিপতি ছিল। তারও আগে বর্তমানের আফগানিস্তান থেকে পূর্বে বোর্নিও পর্যন্ত বিশাল এলাকা ভারতীয় সভ্যতার অধীনে ছিল। কিন্তু কোনো একক মহাশক্তিই কখনো সমস্ত পৃথিবীতে আধিপত্য করতে পারে নি।

তার উম্মতও যে দাজ্জালের পদানত হবে তা এই হাদিসের অর্থের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। তা যদি না হতো তবে তিনি যেভাবে পৃথিবীতে দাজ্জালের আধিপত্য হবে সেখানে না বলে বলতেন- আমার উম্মত তাকে স্বীকার বা অনুসরণ করবে না, বা 'আমার উম্মত' না বলে বলতেন- মানবজাতির এক পঞ্চমাংশ (মুসলিম জাতি পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ) দাজ্জালকে স্বীকার করবে না। তা তিনি বলেন নি এবং তার অর্থ তাঁর উম্মতও দাজ্জালের অধীন হবে। প্রকৃত অবস্থাও তাই।

চৌদ্দ ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **আরবে এমন কোনো স্থান থাকবে না যা দাজ্জালের পদতলে না আসবে বা সেখানে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি না থাকবে।** [বুখারীও মুসলিম]

দাজ্জালের প্রভাব, প্রতিপত্তি যে সমস্ত পৃথিবীময় হবে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীকে সে নেতৃত্ব দেবে এ কথা রসুলাল্লাহ বেশ কয়েকটি হাদিসে বলেছেন। এবার এই হাদিসটিতে তিনি নির্দিষ্ট করে আরবের কথা, তাঁর মাধ্যমে ইসলামের যে শেষ

সংস্করণটি আল্লাহ যে দেশে পাঠিয়েছিলেন সেই আরব দেশের কথা বলছেন। তিনি বলছেন- সেই আরবও দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, তার পদতলে চলে যাবে। আরবে যদিও আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন ও দ-বিধি মোটামুটি চালু আছে, অর্থাৎ ও ব্যাপারে দাজ্জালকে স্বীকার করে নাই, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে আরবের শাসকরা দাজ্জালের অর্থাৎ পাশ্চাত্য শক্তির কাছে নতজানু হয়ে তার আদেশ নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। শুধুমাত্র আইন-কানুন ও দ-বিধি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে আরব নেতারা পাশ্চাত্যের আদেশ-নির্দেশের অধীন এ কথা যারাই ওদের সম্বন্ধে খবর রাখেন তারাই স্বীকার করবেন। কারণও আছে। নেতারা, শাসকরা জানেন যে, মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে গেলে তাদের সিংহাসন, আমীরত্ব থাকবে না। দাজ্জাল তাদের সরিয়ে দিয়ে তার পছন্দমত শাসক নিয়োগ করবে। কাজেই বিশ্বনবী বলেছেন- সমস্ত পৃথিবীতো বটেই, এমনকি সমস্ত আরবও দাজ্জালের পদানত হবে।

পনেরো ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **দাজ্জাল পৃথিবীর সর্বত্র যেতে পারবে ও যাবে কিন্তু মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। মদীনায় প্রবেশের প্রত্যেক দরজায় দু'জন করে মালায়েক (ফেরেশতা) পাহারা দেবে যারা দাজ্জালকে সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না।** [আবু বাকরাহ (রা.) ও ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) থেকে- বুখারী ও মুসলিম]

আজ সমস্ত পৃথিবীর দিকে একবার তাকালেই বিশ্বনবীর এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। মুসলিম বলে পরিচিত জাতিটিসহ অন্যান্য সমস্ত জাতিগুলি দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নীতি ও তার তৈরি আইন-কানুন, অর্থনীতি, দ-বিধি ইত্যাদি গ্রহণ করে সেই মোতাবেক তাদের সমষ্টিগত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা করছে। পৃথিবীতে যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো আছে সেগুলোর সরকার ও জনসাধারণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জালকে রব, প্রভু মেনে নিয়ে তার শেখানো মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করছে।

কাজেই দাজ্জালের প্রভুত্ব আজ সর্বময়। দাজ্জাল পৃথিবীর সর্বত্র যেতে পারবে অর্থ সমস্ত পৃথিবীটাই তার প্রভুত্বের অধীন হবে। শুধুমাত্র মক্কা ও মদীনায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে রসুলাল্লাহ এক হাদিসে বলেছেন ('দাজ্জালের পরিচিতি' অধ্যায়ের চৌদ্দ নম্বর হাদিস) সমস্ত আরব দাজ্জালের পদানত হবে আর এই হাদিসে বলছেন- শুধু মক্কা ও মদীনায় এর ব্যতিক্রম হবে। এর অর্থ হলো মক্কা ও মদীনা এই দু'টি শহর ছাড়া বাকি আরব দেশও দাজ্জালের পদানত হবে। আজ বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর খোদ আরব উপদ্বীপে ইহুদি-খ্রিষ্টান সামরিক বাহিনী প্রবেশ করেছে ও স্থায়ী আসন গেঁড়ে

বসেছে এবং এখন সমগ্র অঞ্চলে ঐ দাজ্জালী সামরিক শক্তিই সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু আজও তারা অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারে নি এবং ইনশাল্লাহ কখনও পারবে না। পারবে না এ কারণে নয় যে মুসলিম নামধারী কিন্তু দাজ্জালের পায়ে সিজদায় পতিত এই জাতির বাধার কারণে। কারণ বিশ্বনবী তাঁর হাদিসেই বলে দিয়েছেন- সেটা হচ্ছে মালায়েকদের দিয়ে পাহারা দেয়া।

ষোল ॥

আল্লাহর রসুল দাজ্জালকে কখনো কখনো **মসীহ উল-কায্‌যাব বলে আখ্যায়িত করেছেন** [আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে মুসলিম]। আবার কখনো কখনো তাকে **মসীহ উদ্‌-দাজ্জাল বলেও বর্ণনা করেছেন** [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম, আবু বাকরাহ (রা.) ও ওবাদাহ বিন্ সোয়ামেত (রা.) থেকে আবু দাউদ]। **ঐ একই শব্দ 'মাসীহ' রসুলাল্লাহ আল্লাহর অন্য নবী ঈসা (আ.) সম্বন্ধেও ব্যবহার করেছেন** [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি]।

আল্লাহও কোর'আনে এই মাসীহ শব্দটি কয়েকবার তাঁর নবী ঈসা (আ.) সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন। **একই শব্দ আল্লাহর একজন নবী ও তার ঠিক বিপরীত, আল্লাহকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অপহরণকারী কাফের, উভয়ের ওপর ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ও অসঙ্গত মনে হয় না কি?** দাজ্জালকে কায্‌যাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী বলার অর্থ সহজ, সে তো অতি অবশ্যই মিথ্যাবাদী, কারণ যে মানবজাতিকে বলবে আমি রব, প্রভু, সে যে বৃহত্তম মিথ্যাবাদী তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং সে যে দাজ্জাল অর্থাৎ চাকচিক্যময়, চোখ-মন ধাঁধানো প্রতারক তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে ও নিজের পূর্ববর্তী নবীকে একই মাসীহ শব্দ প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক। এর জবাব পাওয়া যাবে মাসীহ শব্দটির অর্থ পরিষ্কার হলেই।

'মাসীহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে লেপন করা, আবৃত করা, কোনো কিছুর ওপর হাত বুলানো, জড়িয়ে ফেলা, আচ্ছন্ন বা অন্তর্ভুক্ত করা। এই অর্থে এ দৃষ্টিতে ঈসা (আ.) ও দাজ্জাল দু'জনেই মাসীহ। যদিও ঈসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু বনি-ইসরাইলিদের হেদায়াতের জন্য। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে পল প্রমুখ শিষ্যরা কেমন করে তার শিক্ষাকে খ্রিষ্টান নামে এক ধর্মে রূপান্তরিত করে ঐ ধর্ম ইউরোপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করলেন ও যার ফলে দাজ্জালের জন্ম হলো তা পেছনে লিখে এসেছি ('দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরত্ব' অধ্যায়ের এক নং হাদিস)। পরবর্তীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে মহা শক্তিশালী হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান জাতি ও রাষ্ট্রগুলো তাদের সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীর প্রায় সবটাই দখল করে নিলো। তাদের প্রভাবে ও তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার ফলে ও খ্রিষ্টান প্রচারকদের (Missionary) অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ের ফলে এ বিজিত পৃথিবীর বহু মানুষ ঐ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলো। বর্তমানে খ্রিষ্টানরা

পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ, পৃথিবীর এমন স্থান কমই আছে যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় খ্রিষ্টান নেই। অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্ম সমস্ত পৃথিবীটাকে লেপন, আবৃত করে আছে। বিকৃত হলেও এই ধর্ম ঈসা (আ.) থেকেই উদ্ভুত হয়েছে এবং সমস্ত পৃথিবীকে মাস্‌হ অর্থাৎ লেপন, আবৃত করার কারণেই তার উপাধি মাসীহ। পক্ষান্তরে সেই ঈসা (আ.) থেকেই উদ্ভুত ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাও আজ সমস্ত পৃথিবীকে শুধু লেপন ও আবৃত নয়, পদদলিত করে আছে। কাজেই এরও উপাধি মাসীহ, লেপনকারী, আচ্ছন্নকারী। দাজ্জালকে রসুলাল্লাহ মাসীহ উল কায্‌যাব বলেও অভিহিত করেছেন। কায্‌যাব শব্দের অর্থ মিথ্যাবাদী। দাজ্জাল চাকচিক্যময় বিরাট মিথ্যা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত, আচ্ছন্ন করে আছে, তাই একে বিশ্বনবী নাম দিয়েছেন মাসীহ উল কায্‌যাব।

সতেরো ॥

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **ঈসা (আ.) দাজ্জালকে হত্যা করবেন**। [আব্দুলাহ বিন ওমর (রা.) থেকে মুসলিম এবং নাওয়াস বিন সা'মান (রা.) থেকে মুসলিম ও তিরমিযি]

এ সম্বন্ধে হাদিসসমূহে যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো একত্র করে সাজালে দেখা যায় এমাম মাহদী (আ.) প্রকাশ হবার পর একদিন আসরের সালাতের ঠিক আগে ঈসা (আ.) দু'টি মালায়েকের কাঁধে ভর করে দামেশকের এক মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারের ওপর এসে নামবেন। তিনি ঘোষণা করবেন যে **তিনি দাজ্জালকে হত্যা করতে প্রেরিত হয়েছেন**। পরে এমাম মাহদীর (আ.) নেতৃত্বে দাজ্জালের শক্তিগুলোর সঙ্গে যখন মুসলিমদের জেহাদ হবে তখন ঈসা (আ.) দাজ্জালকে নিজে হত্যা করবেন। রসুলাল্লাহর বর্ণিত ভবিষ্যতের এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে সহিহ হাদিসগুলি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয়। দাজ্জালকে হত্যার করার জন্য দুই হাজার বছর আগের একজন নবীকে নির্দিষ্ট করার কারণ কি? দুই হাজার বছর আগে একজন নবীকে আল্লাহ সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে তাঁকে বোসিয়ে রেখে দিলেন। তারপর হাজার হাজার বছর পরে [ঈসা (আ.) কবে আসবেন আমরা জানি না, তবে ইতোমধ্যেই দুই হাজার বছর পার হয়ে গেছে।] তাঁকে সশরীরে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে দাজ্জালকে ধ্বংস করার জন্য। কেন? আল্লাহ কি দাজ্জালের সমসাময়িক এমাম মাহদীকে (আ.) দিয়ে বা অন্য যে কোনো লোক দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করাতে পারবেন না? বা তাঁর কি আর মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে? (নাউযুবিল্লাহ মিন-যালেক)। আদম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যিনি অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন ও করবেন তাঁর জন্য দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য আর একটিমাত্র মানুষ সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ ছিল? এক ইদরিস্ (আ.) ছাড়া আর কোনো মানুষ সশরীরে আসমানে যেতে পারেন নি এবং ইদরিস্ (আ.) আর কখনও পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না, অথচ একমাত্র ঈসাকে

(আ.) সশরীরে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য। আল্লাহর এই ব্যতিক্রমধর্মী অদ্ভুত কাজের কারণ কি?

কারণ আছে। এ কথা সন্দেহাতীত এবং কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, দু'হাজার বছর আগের ঈসার (আ.) সঙ্গে অন্ততপক্ষে **দু' হাজার বছর পরের (বেশীও হতে পারে) দাজ্জালের এক ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক আছে**। তা না থাকলে, আর কেউ নয়, অন্য কোনো নবীও নয়, এমাম মাহদীও (আ.) নয়, শুধু ঈসাকেই (আ.) নির্দিষ্ট করে আসমানে রেখে দেয়া হয়েছে কেন দাজ্জালকে হত্যা বা ধ্বংস করার জন্য, যে দাজ্জাল ঈসার (আ.) জীবনের হাজার হাজার বছর পর জন্ম নেবে?

যদি আমরা দাজ্জাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে (আকিদা) স্বীকার করে নেই- অর্থাৎ দাজ্জাল শারীরিকভাবে পৃথিবীর মতো বিরাট ঘোড়ায় আসীন এক চক্ষু বিশিষ্ট একটা দানব দৈত্য হবে, তবে প্রশ্ন এই যে, তাকে হত্যা করার জন্য হাজার হাজার বছর আগের একজন বিশেষ, নির্দিষ্ট নবীকে অতীত থেকে ভবিষ্যতে ফিরে আসতে হবে কেন? এ প্রশ্নের সহজ জবাব মিলে যাবে যদি আমরা বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাকে দাজ্জাল বলে চিহ্নিত করি। **প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এবং এ উত্তর ছাড়া আর কোনো উত্তরের যথার্থতা নেই।**

ঈসা (আ.) ধর্মে ছিলেন মো'মেন ও মুসলিম, অন্যান্য সব নবীর মতই, এবং জাতিতে ছিলেন বনি-ইসরাইল, ইহুদি। তাঁর জাতির বিকৃত দীনকে সংস্কার করার চেষ্টা বিফল হবার ফলে তাঁর শিষ্যরা বিপথগামী হয়ে যে জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতার মহাশক্তিশালী দানব সৃষ্টি করলো, যে দানব স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে নিজেকে রব, প্রভু হবার দাবি করলো এবং মানবজাতিকে দিয়ে তা স্বীকার করালো, সে দানবকে হত্যা, ধ্বংস করার দায়িত্ব আর কারো নয়, শুধু ঈসারই (আ.)। ঈসাকে (আ.) আল্লাহর নবী বলে অস্বীকার করে জুডাই ধর্মের আলেমরা অর্থাৎ রাব্বাই, সাদ্দুসাই এবং ফারিসীরা যখন তাদের শাসক রোমানদের দিয়ে তাঁকে ক্রুশে উঠিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করলো তখন আল্লাহ তাঁর নবীকে মালায়েক দিয়ে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর যে শিষ্য মাত্র তিরিশটি মুদ্রার জন্য তাঁকে আলেম ও রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই জুডাস ইস্কারিয়াসের চেহারা ও আকৃতি অবিকল ঈসার (আ.) মতো করে দিলেন। ইহুদি ধর্মের আলেমরা ও রোমানরা তাকেই ঈসা (আ.) মনে করে ক্রুশে উঠিয়ে হত্যা করলো। এমন হতে পারে যে, আসমানে উঠিয়ে নেবার পর আল্লাহ ঈসাকে (আ.) ভবিষ্যতে তাঁর উম্মাহর কাজের ফলে যে দাজ্জালের জন্ম হবে তা দেখিয়ে দিলেন, যা দেখে ঈসা (আ.) আল্লাহকে বললেন- ইয়া আল্লাহ! আমার উম্মতের কাজের ফলের জন্য আমিও অন্তত আংশিকভাবে দায়ী। কাজেই আমার উম্মতের সৃষ্ট দানবকে ধ্বংস করার দায়িত্ব আমাকেই দাও। অথবা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহই ঈসাকে (আ.) বললেন- ঈসা! দ্যাখো, তোমরা উম্মতের ভুলের, বিপথগামীতার ফলে কেমন মহাশক্তিধর দানব সৃষ্টি হয়েছে যে আমার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার

করে নিজেকে রব, প্রভু বলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আমার শেষ নবীর উম্মতসহ মানবজাতি তাকে রব বলে মেনে নিয়েছে। যেহেতু তোমার উম্মত থেকেই এই কাফের দানবের জন্ম, কাজেই তোমাকেই আমি দায়িত্ব দিচ্ছি একে ধ্বংস করার জন্য। দাজ্জালকে হত্যা বা ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে আসমান থেকে হাজার হাজার বছরের অতীতের একজন নির্দিষ্ট নবীকে পৃথিবীতে পাঠাবার অন্য কোনো কারণ আমি দেখি না। যদি কেউ অন্য কারণ বের করতে পারেন তবে তা প্রকাশ করলে আমার ভুল সংশোধন করবো।

এ পর্যন্ত যে হাদিসগুলি পেশ কোরলাম সবগুলিতেই রসুলাল্লাহ দাজ্জালকে সরাসরি উল্লেখ করেছেন। এবার কয়েকটি হাদিস উপস্থাপন করছি যেগুলিতে মহানবী দাজ্জাল শব্দটি ব্যবহার না করেও ঐ দাজ্জালকেই বুঝিয়েছেন। পেছনে আমি প্রমাণ করে এসেছি যে মুসলিম, মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী হবার দাবিদার এই জাতিটিসহ সমস্ত মানবজাতি আজ কয়েকশ' বছর থেকে দাজ্জালকে অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতাকে প্রভু, রব বলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সিজদায় পড়ে আছে, শুধু ব্যক্তিগত জীবনের উপাসনা, ইবাদত ছাড়া আর সর্ববিষয়ে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করছে। এমন কি এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যক্তিজীবনেও ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার নকল করার প্রাণান্ত প্রয়াস করছে। এরই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিশ্বনবী এই হাদিসগুলিতে।

ক) আল্লাহর রসুল বলেছেন- **তোমরা (ভবিষ্যতে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ, অনুকরণ করবে, এমন কি তারা যদি সরীসৃপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাই করবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- হে আল্লাহর রসুল- (যাদের অনুসরণ করা হবে) তারা কি ইহুদি ও খ্রিষ্টান? তিনি জবাব দিলেন- আর কারা** (হাদিস- আবু সাঈদ (রা.) থেকে- বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)?

খ) আল্লাহর রসুল বলেছেন- **নিশ্চয়ই এমন সময় আসছে যখন বনি ইসরাইলিদের এমন পদে পদে অনুকরণ করা হবে যে তাদের কেউ যদি তার মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তবে আমার উম্মাহর মধ্য হতেও কেউ তাই করবে** (হাদিস- আব্দুলাহ বিন আমর (রা.) থেকে- বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)। এই হাদিসটিতে বিশ্বনবী শুধু বনি-ইসরাইল উল্লেখ করেছেন, খ্রিষ্টান উল্লেখ করেন নি, কিন্তু আমি পেছনে দেখিয়ে এসেছি ('দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্ব' অধ্যায়ের এক নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা) আসলে ইহুদি বলতে ইহুদি খ্রিষ্টান উভয়কেই বোঝায় এবং সে জন্য বিভিন্ন হাদিসেও আল্লাহর রসুল শুধু ইহুদি বলে উভয়কেই বুঝিয়েছেন। এই দুইটি হাদিসেও দাজ্জাল শব্দ উল্লেখ না করেও বিশ্বনবী নিঃসন্দেহে দাজ্জালকেই বুঝিয়েছেন।

দাজ্জাল সম্বন্ধে অন্যান্য হাদিস

বইয়ের প্রথম দিকে লিখে এসেছি যে হাদিসসমূহের সত্যতা যাচাইয়ের কঠিন প্রক্রিয়ায় এসনাদের অভাবে বা ত্রুটিতে অনেক সহিহ অর্থাৎ সত্য হাদিসও পরিত্যক্ত হয়েছে, বাদ পড়ে গেছে। দাজ্জাল সম্বন্ধেও কতকগুলো হাদিস আছে যেগুলো এসনাদের অভাবে সহিহ পর্যায়ে নেয়া হয়নি- কিন্তু ওগুলো পড়লেই বোঝা যায় যে ওগুলো সহিহ, কারণ সহিহ হাদিসগুলোর সঙ্গে ওগুলো শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ সম্পূরক। এর মধ্য থেকে একটি হাদিস পেছনে উল্লেখ করে এসেছি যেটায় বলা হয়েছে- দাজ্জালের ঘোড়ার অর্থাৎ বাহনের এক পা থাকবে (পৃথিবীর) পূর্ব (মাশরেক) প্রান্তে, অন্য পা থাকবে পশ্চিম (মাগরেব) প্রান্তে। এখন অন্য দু'একটি হাদিস উল্লেখ করবো।

পেছনে Leopold Weiss অর্থাৎ মোহাম্মদ আসাদের কথা লিখেছি। প্রকৃতপক্ষে তার Road to Mecca বইয়ে দাজ্জাল সম্বন্ধে তার অভিমতই আমাকে এই বিষয়ে চিন্তার প্রেরণা দেয়। তার আগে আমিও অন্যের মতো দাজ্জাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, আকিদাই পোষণ কোরতাম- অর্থাৎ বিরাট ঘোড়ার ওপর উপবিষ্ট এক চক্ষুওয়ালা এক দানব- পৃথিবীর মানুষকে বলছে- আমি তোমাদের রব, প্রভু! আর পৃথিবীর সব মানুষ তাকে রব বলে মেনে নিয়ে তাকে সাজদা করছে। **দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে দাজ্জালের দেয়া রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, মানুষের তৈরি করা আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি তাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করছে।** তার বইটিতে মোহাম্মদ আসাদ দাজ্জাল সম্বন্ধে যে কয়টি হাদিস বললেন তার মধ্যে শুধু একটি বাদে সবগুলো সহিহ। ঐ একটি হচ্ছে এই- **পৃথিবীর অপর প্রান্তে (অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র) কি কথা হচ্ছে দাজ্জাল তা শুনতে পাবে এবং পৃথিবীর অপর প্রান্তে কি হচ্ছে তা দেখতে পাবে।**

এই হাদিসটির অর্থ যে রেডিও ও টেলিভিশন তা তো আহাম্মকও বুঝবে এবং ও দু'টি যে ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার দান তাও সবারই জানা। মোহাম্মদ আসাদ এই হাদিসটি বলেছিলেন মক্কার তখনকার শ্রেষ্ঠ আলেম ও শায়েখ আবদুলাহ ইবনে বুলাইদিদের সামনে যিনি তদানীন্তন বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে সউদকে ধর্ম বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। যেহেতু সেই শায়েখ ঐ হাদিসের সত্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তুললেন না, বরং আসাদের মতেরই সমর্থন করলেন সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে ঐ হাদিস সঠিক। দ্বিতীয়ত, এটা অন্যান্য সমস্ত সহিহ হাদিসের সমার্থক ও সম্পূরক। মহানবীর এই হাদিসটি আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিচ্ছে। যারা হাদিসের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করে দাজ্জালকে একটি দানব বা দৈত্য হিসেবে নিচ্ছেন তাদের মতে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের কথা দাজ্জাল

একাই শুনতে ও দেখতে পাবে। কিন্তু বেতার ও টেলিভিশন কি আজ শুধু একজন শুনতে ও দেখতে পায়? অবশ্যই নয়। **অর্থাৎ দাজ্জাল একটা মাত্র ব্যক্তি বা জিনিস (Unit) নয়, দাজ্জাল হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার মহাশক্তিশালী বিরাট একচক্ষু দানব ও তার অনুসারীরা।**

আরও একটি চিত্তাকর্ষক হাদিস পাঠকদের সামনে পেশ করছি। এটারও সনদ আমার জানা নেই। অনেক দিন আগে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে শুনেছিলাম। তখন দাজ্জাল সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আগ্রহও ছিল না, দাজ্জালের ঘটনা ও আবির্ভাব যে এত গুরুত্বপূর্ণ তাও জানতাম না। কাজেই যিনি এ হাদিসটি আমায় বলেছিলেন তাকে হাদিসের সনদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি নি। তাকে আজ আর মনেও নেই। তবে হাদিসটি ভুলি নি, মনে আছে। হাদিসটি এই- দাজ্জাল সম্বন্ধে বলার সময় আল্লাহর রসুল যখন দাজ্জাল খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে বললেন তখন কোনো কোনো সাহাবা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কেমন দ্রুত সে গতি হবে? তখন বিশ্বনবী বললেন- **জুম্মার সালাহ্ কায়েম করতে যে সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে দাজ্জাল সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে।**

আমরা জানি যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা আকাশে যে উপগ্রহগুলো (Satellite) চালু করেছে সেগুলোর গতি ঘণ্টায় কমবেশী ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) মাইল। এই গতিতে পৃথিবীকে এক চক্কর ঘুরে আসতে এই উপগ্রহগুলোর সময় লাগছে ৯০ থেকে ৯৫ মিনিট। এই নির্দিষ্ট গতির কারণ আছে। উপগ্রহসহ যে কোনো বস্তুর গতি যদি ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইলের চেয়ে কম হয় তবে তা শূন্যে থাকতে পারবে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের (Gravity) টানে তা পৃথিবীর বুকে পড়ে যাবে। আবার উপগ্রহগুলোর গতি যদি ঘণ্টায় ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) মাইলের বেশি হয় তবে ওগুলো মাধ্যাকর্ষণের টেনে রাখার শক্তিকে পরাজিত করে মহাশূন্যে চলে যাবে, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে না। এই জন্য ঘণ্টায় ২৪,০০০ মাইলের বেশি গতির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Escape Velocity অর্থাৎ যে Velocity বা গতি লাভ করলে কোনো বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাইরে, মহাকাশে চলে যেতে পারে। কাজেই উপগ্রহগুলোকে পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে (ঙৎনরঃ) ধরে রাখার জন্য ওগুলোর গতি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল রাখতে হয়েছে। এই উপগ্রহগুলো শুধু যে যন্ত্র তাই নয়, ওর মধ্যে মানুষও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবস্থান করছে। যেসব রকেট মহাশূন্যে পাঠানো হচ্ছে সেগুলির গতি ঘণ্টায় ২৪,০০০ মাইলের বেশি করা হচ্ছে।

আল্লাহর রসুলের সময় ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের হিসাব ছিল না। কাজেই দাজ্জালের পৃথিবীর ঘুরে আসার সময়টা তাঁকে বলতে হয়েছে অন্য কোনো কাজের সময়ের উদাহরণ দিয়ে, এবং সেটা তিনি দিয়েছেন সবচেয়ে প্রযোজ্য উদাহরণ, জুম্মার নামাযের সময় দিয়ে। জুম্মার নামাযের প্রস্তুতি অর্থাৎ গোসল করা, কাপড়-চোপড় পরা, মসজিদে যাওয়া, খোত্‌বা শোনাসহ নামায পড়া, পরিচিতদের সঙ্গে

দু'চারটি কথা বলা ও বাড়ীতে ফিরে আসা। সব মিলিয়ে মোটামুটি ৯০ থেকে ৯৫ মিনিটের মতই সময় লাগে। অনেকে বলতে পারেন ও সব কিছু সত্ত্বেও জুম্মার নামাযে ৯০/৯৫ মিনিট সময় লাগে না। এ কথাটিও ঠিক। বর্তমানের বিকৃত, আল্লাহর-সুলের প্রদর্শিত দিক-নির্দেশনার বিপরীতমুখী, দাজ্জালের পায়ে সিজদায় অবনত 'মুসলিম'দের জুম্মায় সময় কম লাগে। কারণ এখন জুম্মা অর্থ খোত্বা শোনা (যে খোতবার কোনো অর্থই এরা বোঝেন না) ও দু'রাকাত নামায পড়া। কিন্তু রসুলাল্লাহর সময় মসজিদ ছিল তার উম্মাহর সমস্ত রকমের কর্মকা-ের প্রাণকেন্দ্র। কাজেই জুম্মায় এখনকার চেয়ে সময় বেশি লাগতো। যেহেতু উপগ্রহ ও মহাকাশচারী রকেটগুলো ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভাবন সুতরাং নিঃসন্দেহে এই সভ্যতাই দাজ্জাল।

এ হাদিসগুলির ব্যাখ্যা থেকে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে আল্লাহর রসুল কর্তৃক বর্ণিত আখেরী যামানার দাজ্জাল কোনো দৃশ্যমান (Visible) বা শরীরী (Physical) দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদের বোঝাবার জন্য এটি একটি রূপক (Allegorical) বর্ণনা যে কথা পেছনে বলে এসেছি। এর পরও যদি কেউ জোর করে বলতে চান যে, না, এক চক্ষুবিশিষ্ট, বিরাটকায়, জ্বলজ্যান্ত একটি অশ্বারোহী দানবই আসবে, তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ধরুন আপনার কথামত এক চক্ষুবিশিষ্ট এক বিশাল দানব পৃথিবীতে উপস্থিত হলো, তার বাহন ঘোড়া বা গাধার দুই কানের ব্যবধানই সত্তর অর্থাৎ বহু সহস্র হাত (দেখুন দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১ নং হাদিস), তাহলে কি কারো মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে যে এটাই রসুল বর্ণিত সেই দাজ্জাল? **চোখের সামনে প্রায় পৃথিবীর সমান আয়তনের এক দানবকে দেখে প্রথমেই সকলের মনে প্রশ্ন আসবে, এই বিরাট দানব আসলো কোত্থেকে! তাকে দেখে কেবল মুসলিমরাই নয়, অমুসলিমরাও এক মুহূর্তে চিনে ফেলবে যে, এই তো ইসলামের নবীর বর্ণিত দানব দাজ্জাল। সকল মানুষেরই তখন আমাদের নবীর উপর এবং ইসলামের উপর ঈমান এসে যাবে।**

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রসুল বলেছেন, দাজ্জাল ইহুদি জাতি থেকে উদ্ভূত হবে এবং আমার উম্মতের সত্তর হাজার (অসংখ্য) লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে (দেখুন দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ৩ নং হাদিস)। দাজ্জাল যদি রসুলের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যিই জ্যান্ত কোনো দানবীয় প্রাণী হয় তাহলে কি করে এমন দানব মানব সমপ্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ইহুদি জাতির মধ্য থেকে আসতে পারে? আর মুসলিমরাই কি করে আল্লাহকে ছেড়ে একটি দানবকে অনুসরণ করতে পারে?

তৃতীয়ত, আল্লাহর রসুল বলেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো'মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো'মেন নয়, তারা পড়তে পারবে না (দেখুন দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১১ নং হাদিস)। অর্থাৎ কিছু লোক (মো'মেন) দাজ্জালকে কাফের বলে বুঝতে পারবে আর কিছু লোক (যারা মোমেন নয়) দাজ্জাল যে কাফের তা বুঝতে

পারবে না, এবং বুঝতে পারবে না বলেই বহু সংখ্যক লোক তাকে রব বলে মেনে নেবে। দাজ্জাল যদি শরীরী কোনো দানবই হয় তাহলে সবাই তাকে প্রথম দর্শনেই দাজ্জাল বলে চেনার কথা। তারপরও সে কাফের কি কাফের নয় এ নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বিমত হওয়া সম্ভব? ধরুন, কোনো লোকালয়ে বা জনবহুল স্থানে হঠাৎ একটি বাঘ এসে পড়লো; সেখানের অবস্থাটা কি হবে ভাবুন। ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারবে দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা করবে, তাই নয় কি? অথচ অকল্পনীয় বিরাট, ভয়ঙ্কর একটি দানব, যার বাহনের এক পা পৃথিবীর এক প্রান্তে আরেক পা পৃথিবীর অপর প্রান্তে, তাকে সামনা সামনি দেখেও কেউ চিনবে- কেউ চিনবে না, কেউ তাকে অনুসরণ করবে- কেউ করবে না, কেউ তার কপালের কাফের লেখা পড়তে পারবে- কেউ পারবে না এ কি হতে পারে?

তাহলে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে দাজ্জাল কোনো শরীরী বা বস্তুগত দানব নয়, এটি একটি বিরাট শক্তির রূপক বর্ণনা; সেই সাথে এ কথাতেও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে ঐ বিরাট শক্তিটিই হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা।

বাইবেলে দাজ্জাল

বাইবেলের নতুন নিয়মে (New Testament) ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে, পৃথিবীর শেষ সময়ে (Last hour) Anti-Christ আবির্ভূত হবে। Anti-Christ-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে খ্রিষ্ট-বিরোধী। আমি মনে করি এই Anti-Christ-ই বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল। অবশ্য দাজ্জাল শব্দের অর্থ যেমন বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতাকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে Anti-Christ শব্দটা ততটা করে না। দাজ্জাল শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা এমন চাকচিক্যময় যে তা মানুষের মন মগজকে বিমোহিত করে ফেলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ প্রতারক, বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার নিখুঁত বর্ণনা। এই আত্মাহীন সভ্যতার যান্ত্রিক প্রযুক্তির উৎপাদিত বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তু মানুষের মনকে ধাঁধিয়ে ফেলে, কিন্তু ভেতরে আত্মা নেই বলে এর অনুসারীদের মানবেতর জীবে পরিণত করে।

বাইবেলের চার জায়গায় Anti-Christ (খ্রিষ্ট-বিরোধী বা জিশু-শত্রু) এর উল্লেখ আছে। আমি একটা একটা করে ওগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আল্লাহর রসুল বর্ণিত দাজ্জালের সাথে বাইবেল বর্ণিত Anti-Christ-এর সাদৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই উদ্ধৃতিগুলো দিচ্ছি New World Testament of the Holy Scriptures থেকে। Authorised of King James Version-এর সঙ্গে এর ভাষার কিছু পার্থক্য ছাড়া মূল বক্তব্যে কোনো অমিল নেই।

1. Young children, **it is the last hour**, and, just as you have heard that Anti-Christ is coming even now there have come to be many Anti-Christs; from which fact we gain the knowledge that is **the last hour** (Acts: 1 Jo:18).

অর্থাৎ- তরুণ সন্তানগণ! এখন পৃথিবীর শেষ সময় এবং তোমরা শুনেছো যে খ্রিষ্ট-বিরোধী (জিশু-শত্রু) আসছে; ইতোমধ্যেই অনেক জিশু বিরোধী এসে গেছে যা থেকে আমরা জানতে পারছি যে এটাই শেষ সময় (আখেরী যামানা)।

বিশ্বনবীর বর্ণিত দাজ্জালের সঙ্গে এখানে দু'টি মিল পাচ্ছি। একটি দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় অর্থাৎ আখেরী যামানা (Last hour) দ্বিতীয়টি বিশ্বনবী নির্দিষ্ট দাজ্জালকে ছাড়াও অন্যান্য যালেম, প্রতারক, মিথ্যাবাদীকে কখনো

কখনো দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন। যদিও আখেরী যামানার নির্দিষ্ট দাজ্জালের কথাও ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। বাইবেলে একাধিক Anti-Christ ইতোমধ্যেই এসে গেছে বলা হয়েছে।

2. Who is the liar if it is not the one that denies that Jesus is the Chirst? This is the Anti-Christ, the one that denies the Father and the Son (Acts: 1 Jo 2:22).

অর্থাৎ- যে জিশুকে খ্রিষ্ট বলে **অস্বীকার** করে সে যদি মিথ্যাবাদী না হয় হবে **মিথ্যাবাদী** আর কে? সেই হচ্ছে **খ্রিষ্ট-বিরোধী** (জিশু-শত্রু) Anti-Christ যে পিতা (Father) এবং পুত্রকে (Son) **অস্বীকার** করে।

বিশ্বনবী দাজ্জালকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেন এখানে বাইবেলে Anti-Christ সম্বন্ধে ঠিক সেই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- ষরধৎ, মিথ্যাবাদী। বাইবেলে Anti-Christ কে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এই জন্য যে সে পিতা (God) ও পুত্রকে (Jesus) অস্বীকার করবে।

মনে রাখতে হবে খ্রিষ্টানরা তাদের বিকৃত আকিদায় ঈসাকে (আ.) আল্লাহর ছেলে এবং উভয়কে একই সত্তা বলে মনে করে। অর্থাৎ বাইবেলের কথায় বলা হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করবে। মহানবী বলেছেন দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব বলে ঘোষণা করবে ও মানবজাতিকে বলবে তাকে রব বলে স্বীকার করে নিতে- অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার করতে।

3. Every inspired expression that confesses Jesus Christ as having come in the flesh originates with God, but every inspired expression that does not confess Jesus does not originate with God. Furthermore, this is the Anti-Christ's (inspired expression) which you have heard was coming, and now it is alreadz in the world (Acts: 1 Jo 4:2, 3).

অর্থাৎ- প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি যেটা স্বীকার করে যে জিশুখ্রিষ্ট রক্ত-মাংসে আবির্ভূত হয়েছেন সেটা ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি যেটা জিশুকে স্বীকার করেন না সেটা, ঈশ্বরের নিকট থেকে আসে নাই। অধিকন্তু, সেটাই হচ্ছে জিশু বিরোধীর, Anti-Christ (প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি) **ভবিষ্যতে যার আগমন সম্বন্ধে তোমরা শুনেছো**, এবং সে ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে এসে গেছে।

বাইবেলের এই কথাগুলিতেও আমরা পাচ্ছি যে Anti-Christ ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে (which you have heard was coming) এবং সে জিশুকে অস্বীকার করবে। মহানবীর কথারই পুনরাবৃত্তি।

4. For many deceivers have gone forth in the world, persons not confessing Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the Anti-Christ (Acts: 2 Jo-7).

অর্থাৎ- অনেক প্রতারক পৃথিবীতে এসেছে জিশুখ্রিষ্ট রক্ত মাংসে আবির্ভূত হয়েছেন এ কথা যারা স্বীকার করেন নাই। এরাই হচ্ছে প্রতারক, জিশু বিরোধী (Anti-Christ)।

বাইবেলের এই কথাগুলো বিবেচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর কেতাব বাইবেল (ইন্‌জিল) আর সে প্রকৃত বাইবেল নেই। মুসা (আ.) যে হিব্‌রু ভাষায় কথা বলেছেন সে ভাষাই নেই, বাইবেলও সে ভাষায় নেই। ঈসা (আ.) যে এ্যারামাইক ভাষায় কথা বলতেন, সেই এ্যারামাইক ভাষায় লিখিত বাইবেল (ইন্‌জিল) পৃথিবীর কোথাও নেই (গত শতাব্দে Gospel of Barnabas অর্থাৎ ঈসার (আ.) ঘনিষ্ঠ সাহাবী বার্নাবাসের লিখিত বাইবেলটি তার কবর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে খ্রিষ্টান পুরোহিত সমাজ সেটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি কারণ এ বাইবেলটিতে ঈসার (আ.) বক্তব্য মোটামুটি অবিকৃত অবস্থায় আছে, ফলে তা প্রচলিত বাইবেলগুলির সাথে বুনিয়াদি বিষয়গুলিতে সাংঘর্ষিক)। আদি বাইবেল প্রথমে গ্রীক ও পরে ল্যাটিন (রোমান) ও পরে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে অন্যরূপ ধারণ করেছে। বাইবেলের আদি একেশ্বরবাদ (তওহীদ) বিকৃত হয়ে ত্রিত্ববাদে পরিণত হয়েছে যেমন ইবরাহীম (আ.) তওহীদ ভিত্তিক মিল্লাতে ইবরাহীম অর্থাৎ দীনে হানিফ ক্রমে বিকৃত হয়ে আরবের পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়েছিল। কাজেই Anti-Christ অর্থাৎ দাজ্জাল সম্বন্ধে বাইবেলের ভাষাও অবশ্যই বদলে গেছে। এতকিছু সত্ত্বেও বহু অনুদিত, বিকৃত বাইবেলেও চারবার উল্লেখ করা Anti-Christ সম্বন্ধে যে কয়টি বিষয় বলা হয়েছে তার মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে বিশ্বনবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ক) আল্লাহর রসুল বলেছেন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে আখেরী যামানায়। বাইবেল বলছে Anti-Christ-এর আবির্ভাব হবে last hour-এ, অর্থাৎ আখেরী যামানায় (Acts: ১ Jo. ২:১৮, ৪:৩)।

খ) মহানবী বলেছেন দাজ্জাল আল্লাহকে অস্বীকার করে নিজে রব হবার দাবি করবে। বাইবেল বলছে Anti-Christ পিতা (Father,God) ও পুত্রকে (Son, Jesus) অস্বীকার করবে (Acts: ১ Jo. ২:২২, ৪:৩, ২ Jo ৭)।

গ) বিশ্বনবী দাজ্জালকে প্রতারক বলেছেন। বাইবেলও Anti-Christ কে Deceiver (প্রতারক) বলছে (Acts ২ Jo ৭)।

ঘ) আল্লাহর নবী দাজ্জালকে মিথ্যাবাদী (কায্‌যাব) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাইবেলও Anti-Christ কে Liar (মিথ্যাবাদী) বলছে (Acts: ১ Jo ২:২২)।

এটি একটি বিরল ও নিষ্ঠুর পরিহাস যে, যে খ্রিষ্টানরা (যদিও তখনও তারা সম্পূর্ণ হয় নি, আংশিকভাবে জুডাই অর্থাৎ ইহুদি ধর্মেই আছে) বাইবেলে যে Anti-Christ-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবং মানুষকে সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছেন, অথচ জানেন না তাদেরই কাজের ফলে Anti-Christ অর্থাৎ দাজ্জালের জন্ম হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরাই হবে Anti-Christ এর প্রথম সারির অনুসারী ।

কিন্তু... ... ...

দাজ্জাল ও বর্তমান ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা একই বস্তু ও যান্ত্রিক শক্তিই এর বাহন কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক প্রযুক্তিটাই খারাপ বা বর্জনীয়, এই বই পড়ে এ ধারণা যেন কারো মনে না আসে। কোনো জিনিস ভালো কি মন্দ তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই জিনিসের ব্যবহারের ওপর। একটা অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি বা খুন করা যায়, সেই অস্ত্র দিয়েই আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা যায়, খুনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে অসহায়কে রক্ষা করা যায়। অস্ত্র নিজে দায়ী নয়, যে সেটাকে ব্যবহার করবে দায়ী সে। দাজ্জাল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে অন্যায়ভাবে। চিকিৎসা, কৃষি, আবহাওয়া ইত্যাদি কিছু বিষয়ে ঐ প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও তার প্রধান অংশই ব্যবহৃত হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে। এ কথা প্রমাণ করার দরকার পড়ে না, পাশ্চাত্য সভ্যতার সরকারগুলির সামরিক খাতে ব্যয়ের সাথে অন্যান্য খাতে ব্যয়ের একটি তুলনাই এ কথা পরিষ্কার করে দেবে। সামরিক খাতে ঐ ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাকি পৃথিবীকে পদানত করে রাখা। তেমনিভাবে দাজ্জালের সৃষ্ট রেডিও টেলিভিশন মানুষকে ভালো অনেক কিছু শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা, সহিংসতা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ, নগ্ন যৌনতা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে তাকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ যে বিরাট, বিশাল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তা তিনি বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই করেছেন। আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে তিনি তাকে সব জিনিসের নাম শেখালেন (সুরা বাকারা, আয়াত ৩১)। সব জিনিসের নাম শেখানোর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে কোন্ জিনিসের কি কাজ, কোন্ জিনিস দিয়ে কি কাজ হয় তা শেখানো, এক কথায় বিজ্ঞান, কারণ সমস্ত সৃষ্টিটাই বৈজ্ঞানিক। আর আদমকে (আ.) শেখালেন অর্থ মানুষ জাতিকে শেখালেন। **কোর'আনের এই আয়াত এই অর্থ বহন করে যে, মানুষ অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এই বৈজ্ঞানিক মহাসৃষ্টির অনেক তথ্য, অনেক রহস্য জানতে পারবে।** মানুষ জাতির বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আবিষ্কার করছেন আল্লাহর সৃষ্ট কোন্ জিনিস দিয়ে কী হয়, আর তা প্রযুক্তিতে ব্যবহার করছেন। আল্লাহ্ কোর'আনে তাঁর বিরাট সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাববার, গবেষণা করার জন্য বারবার বলেছেন, **বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।**

আল্লাহর ঐ আদেশ অনুযায়ী কাজ করার ফলে এই মুসলিম জাতিতে অতীতে বিরাট বিরাট জ্ঞানী, বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে, যাদের কাজের ওপর, গবেষণার ফলের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সম্ভব হয়েছে। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানে, চিকিৎসায়, দর্শনে,

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, রসায়নে, এক কথায় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিরাট অগ্রগতি করার পর আকিদার বিকৃতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে, অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এই জাতি যখন ফতোয়াবাজি শুরু করলো তখন স্বভাবতঃই সেটা অজ্ঞানতার ও অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হলো। আর তাদের কাজের, গবেষণার পরিত্যক্ত ভিত্তির ওপর অগ্রগতি করে দাজ্জাল তার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বিশাল ইমারত গড়ে তুললো। পদার্থ বিজ্ঞানে ইবনে হাইসাম, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সিনা, আল নাফীস, আল রাজী, অংক শাস্ত্রে আল খাওয়ারিযমী, আলকিন্দী, আল ফরগানী, সাধারণ বিজ্ঞানে ওমর খাইয়াম, বিবর্তনবাদে ইবনে খালদুন প্রমুখ মনীষীরা বিজ্ঞানে প্রতি অঙ্গনে গবেষণা করে যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, আজ দাজ্জালের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির শক্তি তারই ফল। **দাজ্জাল অন্যায় ও অপব্যবহার করছে বলেই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও যন্ত্র বর্জনীয় হতে পারে না- বর্জনীয় হচ্ছে ওর অপব্যবহার।**

যেহেতু আল্লাহ তাঁর খলিফা আদমকে (আ.) নিজ হাতে সৃষ্টি করে তাকে জ্ঞান বিজ্ঞান শেখালেন, সেহেতু মনে রাখতে হবে যে **জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো বিশেষ জাতির বা বিশেষ সভ্যতার সম্পদ নয়।** সৃষ্টির পর থেকেই মানবজাতি এই জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রগতি করে আসছে। অতীতে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা করে ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন তাদের সেই ভিত্তির ওপর বর্তমানের গবেষক, বিজ্ঞানীরা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ করছেন এবং আজকের বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলকে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা আরও সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এতে কোনো জাতির, কোনো সভ্যতার মালিকানা নেই, এর মালিকানা সমগ্র মানবজাতির। **বীজগণিত** (Algebra) **আল খাওয়ারিযমী এবং ত্রিকোণমিতি** (Trigonometry) **আল বাত্তানী আবিষ্কার করেছেন বলেই যেমন ঐ বিজ্ঞান মুসলিম জাতির সম্পদ নয় তেমনি আপেক্ষিক তত্ত্ব** (Theory of Relativity) **অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন বলেই তা ইহুদি জাতির সম্পদ নয়- সবগুলোই সমগ্র মানবজাতির সম্পদ।**

মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা করে তাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছে। যখন যে জাতি বা সভ্যতার প্রাণশক্তি (Dynamism) বৃদ্ধি পেয়েছে সেই জাতি বা সভ্যতা জ্ঞান, বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সমগ্র মানবজাতি তা থেকে উপকৃত হয়েছে। এখানে আল্লাহর রসুল একটি হাদিসের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন- **জ্ঞান আহরণের জন্য চীনেও যাও** (হাদিস- আনাস (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত)। বিশ্বনবীর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে (Science and Technology) চীনদেশ ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত, তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের (উম্মাহ) তদানীন্তন পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র চীনে যেয়ে ঐ জ্ঞান আহরণের আদেশ দিয়েছেন।

এ কথা আহাম্মকেও বুঝবে যে এই হাদিসে 'জ্ঞান' শব্দ দিয়ে তিনি দীনের জ্ঞান বোঝান নি, কারণ আল্লাহর রসুলকে মদিনায় রেখে দীনের জ্ঞান শেখার জন্য চীনে যাওয়ার, যে চীন তখনও ইসলামের নামই শোনে নি, কোনো অর্থই হয় না। বিশ্বনবী এখানে 'জ্ঞান' বলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বুঝিয়েছেন। মহানবীর ঐ আদেশের সময় এই জাতিটি, যেটা বর্তমানে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, সেটা জীবিত (Dynamic) ছিল, এবং জীবিত ছিল বলেই সেটা নেতার আদেশ শিরোধার্য করে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে পৃথিবীর শিক্ষকের আসন অধিকার করে নিয়েছিল। তারপর আল্লাহ ও রসুল জ্ঞান বলতে যা বুঝিয়েছেন তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যখন এ জাতি 'জ্ঞান' কে শুধু ফতোয়ার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করল তখন এটা অশিক্ষা-কুশিক্ষায় পতিত হয়ে মৃত হয়ে গেল এবং আজও সেই মৃতই আছে।

আল্লাহ 'জ্ঞান' বলতে কি বুঝেন? মুসা (আ.) একবার আল্লাহকে সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল- আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী কে? আল্লাহ বললেন যে জ্ঞানার্জনে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং **মানুষের অর্জিত জ্ঞানকেও** যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের মধ্যে জমা করতে থাকে (হাদিসে কুদসী- আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বায়হাকী ও ইবনে আসাকির; আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (রঃ) এর 'হাদিসে কুদসী' গ্রন্থের ৩৪৪ নং হাদিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আল্লাহ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি তাঁর দেয়া জ্ঞান যা তিনি সৃষ্টির প্রথম থেকে তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে তাঁর কেতাবসমূহে মানবজাতিকে অর্পণ করে আসছেন, যার শেষ কেতাব বা বই হচ্ছে আল- কোর'আন। এটা হচ্ছে অর্পিত জ্ঞান। আর মানুষ পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে জ্ঞান অর্জন করে তা হলো অর্জিত জ্ঞান। মুসার (আ.) প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে 'মানুষের অর্জিত জ্ঞান' বললেন, শব্দ ব্যবহার করলেন 'আন্নাসু', মানুষ। অর্থাৎ যে আল্লাহর অর্পিত জ্ঞান, অর্থাৎ দীন সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞান- এই উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে থাকে এবং কখনোই তৃপ্ত হয় না অর্থাৎ মনে করে না যে তার জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হয়েছে, আর প্রয়োজন নেই, সেই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী, আলেম। বর্তমানে যারা নিজেদের আলেম, অর্থাৎ জ্ঞানী মনে করেন, আল্লাহর দেয়া জ্ঞানীর সংজ্ঞায় তারা আলেম নন, কারণ শুধু দীনের জ্ঞানের বাইরে মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সম্বন্ধে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই এবং সেই জ্ঞান সম্বন্ধে পিপাসাও নেই।

আমি পেছনে একাধিকবার বলে এসেছি যে আজ মুসলিম বলে পরিচিত এই জাতিটি, যেটি নিষ্ঠাভরে সালাহ, যাকাহ, হজ, সওম (রোযা) ছাড়াও হাজারো নফল ইবাদত ও তাকওয়া অবলম্বন করে সেটি তার আকিদার বিকৃতিতে ইলাহ শব্দের অর্থ যে সার্বভৌমত্ব তা না বুঝে, সেটাকে মা'বুদ অর্থাৎ উপাস্য মনে করে, অজ্ঞানতার অন্ধত্বের কারণে দাজ্জালের পায়ে সিজদায় পড়ে আছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে অনেকেই আমার এ কথায় বিব্রত হবেন, অনেকে ঘোর আপত্তি করবেন তারা বলবেন- কখনোই না! আমরা দাজ্জালকে সাজদা করি না। আমরা শুধু আল্লাহকে সাজদা করি। সাজদা করার অর্থ কি? সাজদার প্রকৃত অর্থ হলো কাউকে, কোনো শক্তিকে সর্বতোভাবে স্বীকার করে নেয়া, তার তৈরি করা আইন-কানুন, তার আকিদাকে মেনে নেয়া, তার দেয়া মূল্যবোধকে, ন্যায়-অন্যায়ের মানদ-কে স্বীকার করে তা জীবনে কার্যকর করা, তার নিয়ম মোতাবেক চলা; শুধু মাথা মাটিতে ঠেকানোই সাজদা নয়। আকাশ, মাটি, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা, এক কথায় সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহকে সাজদা করে (কোর'আন- সুরা রা'দ, আয়াত ১৫; সুরা আর রহমান, আয়াত ৬) অর্থাৎ এরা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে। এরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহকে সাজদা করে না।

দাজ্জাল নিজেকে রব অর্থাৎ প্রভু, পালনকর্তা বলে ঘোষণা করবে ও মানবজাতিকে তা স্বীকার করতে আদেশ করবে। মুসলিম বলে পরিচিত এ জাতিটিসহ সমস্ত মানবজাতি দাজ্জালকে স্বীকার করে নিয়েছে ও তার পায়ে সিজদায় পড়ে আছে অর্থাৎ দাজ্জালের সৃষ্ট বিভিন্ন 'তন্ত্র' বা 'বাদ'গুলিকে গ্রহণ করে তাদের জাতীয় জীবনে তা প্রয়োগ করে সেই মোতাবেক তাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করছে- এক কথায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ করে দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করেছে, আল্লাহর দেয়া মূল্যবোধকে ত্যাগ করে দাজ্জালের দেয়া মূল্যবোধকে গ্রহণ করে তাকে রব বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

মানবজাতির বর্তমান অবস্থা

১৪০০ বছর আগে আল্লাহর শেষ রসুল আমাদের এই সময় সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি করে গেছেন আজ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হচ্ছে। পৃথিবীতে একটা টুকরো মাটি বা পানি নেই যা দাজ্জালের (ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার, Judeo-Christian Technological Civilization) শক্তি ও প্রভাব বলয়ের বাইরে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১৩ নং ও ১৪ নং হাদিস)। মানবজাতির কাছে দাজ্জাল দাবি করছে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেন তাকে রব (প্রভু, প্রতিপালক) বলে মেনে নেয়, অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে পরিত্যাগ করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়। মানুষের সার্বভৌমত্বের যে কয়টি ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদিকে পরাজিত করে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রই জয়ী এবং এর সার্বভৌমত্বই মেনে নেয়ার দাবি দাজ্জালের। দাজ্জালের এই দাবির কাছে মানবজাতি আজ আত্মসমর্পণ করেছে। যে ইসলামের ভিত্তিই হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (তওহীদ), যে সার্বভৌমত্ব ছাড়া ইসলামই নেই, সেই ইসলামের দাবিদার, 'মুসলিম' বলে পরিচিত জনসংখ্যাটিও ভুল আকিদার কারণে প্রায় সম্পূর্ণটাই ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাবভৌমত্ব মেনে নিয়েছে, অর্থাৎ দাজ্জালের পায়ে সেজদায় প্রণত হয়েছে। দাজ্জালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা তো বটেই, দাজ্জালের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ইত্যাদিতে (এ বিষয়ে পাঠকের কৌতুহল হলে তাকে আমার লেখা "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইটি পড়তে অনুরোধ করছি), যেখানে দাজ্জালের তৈরি করা ইসলামের আলেম ওলামা, আল্লামা, মাশায়েখরাও দাজ্জালের দেয়া মানুষের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়েও ভাবছেন তারা মো'মেন, মুসলিমই আছেন।

এই মুসলিম জনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। **এই ক্ষুদ্র অংশটিরও ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক আকিদা নেই।** মানুষ সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে তাকে তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি নিযুক্ত করে (সুরা বাকারা, আয়াত ৩০), মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের আত্মা ফুঁকে দিয়ে (সুরা হেজর, আয়াত ২৯; সুরা সাজদা, আয়াত ৯; সুরা সা'দ, আয়াত ৭২), তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে (সুরা বাকারা, আয়াত ৩৬), মানুষের দেহ-আত্মার মধ্যে ইবলিসকে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে (সুরা বনী ইসরাইল ৬৪), তারপর আবার নবী-রসুল পাঠিয়ে মানুষকে হেদায়াহ অর্থাৎ দিক নির্দেশনা দিয়ে (সুরা বাকারা, আয়াত ৩৮) তার উদ্দেশ্য কি, এক কথায় ইসলাম কী এ সম্বন্ধে তাদের সঠিক আকিদা (Comprehensive Concept) নেই। অথচ তারা আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে ও দীনুল ইসলামকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, আর তাই তারা দাজ্জালের দাবি

গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্বকে মানতে রাজী নন, তারা চান পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। দুর্ভাগ্যক্রমে এরা জানেন না সত্যদীন (দীনুল হক) কী, এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রক্রিয়া কী। **এরা খ্রিষ্টানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় খ্রিষ্টানদের তৈরি করা এক প্রাণহীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য ভুল পথে, ভুল প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করছেন।** দাজ্জালের পৃথিবীব্যাপী মহাশক্তির বিরুদ্ধে এরা অসহায়। দাজ্জালের প্রযুক্তি (Technology), অসংখ্য বোমারু বিমান, অসংখ ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই নেই। তাই তারা মরিয়া হয়ে এখানে ওখানে বোমা মেরে, পর্যটন কেন্দ্রে হামলা করে দাজ্জালকে প্রতিহত করতে চাইছেন। আল্লাহ, রসুল ও ইসলামের জন্য এরা এমন উৎসর্গীকৃত যে তারা শরীরে বোমা বেঁধে তা ফাটিয়ে শত্রু হত্যা করতে চেষ্টা করছেন। **তারা বুঝছেন না দাজ্জালকে প্রতিরোধ, সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠার এগুলো সঠিক পথ নয়,** সমস্ত পৃথিবী যার হাতে, 'মুসলিম' নামসর্বস্ব জনসংখ্যাসহ সমস্ত মানবজাতি যার পায়ে সিজদায় প্রণত **সে মহাশক্তিধর দানবের এতে কিছুই হবে না। কিছু তো হবে না-ই বরং তার লাভ হবে এবং হচ্ছে।** এদের 'সন্ত্রাসী' (Terrorist), 'মৌলবাদী' (Fundamentalist), 'চরমপন্থী' (Extremist), 'জঙ্গি' (Militant) ইত্যাদি বহুবিধ নামে আখ্যায়িত করে, 'মুসলিম' জনসংখ্যাসহ সমস্ত মানবজাতিকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। এই মুসলিম জনসংখ্যার মহা-মুসুল্লীগণও যারা দাজ্জালের পায়ে সিজদায় পড়ে আছেন তারা এই 'সন্ত্রাসীদের' বিরুদ্ধে, তাদের তারা ঘৃণা করেন।

দাজ্জালের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এই অতি ক্ষুদ্র দলকে বুঝতে হবে দাজ্জালকে প্রতিরোধের এই পথ ভুল। তাদের বুঝতে হবে ইসলাম অর্থাৎ সত্যদীন (দীনুল হক) কী এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রক্রিয়া কী। তাদের বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে যে **পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র সঠিক নীতি, পথ ও প্রক্রিয়া হচ্ছে শুধু সেইটা যেটা আল্লাহর রসুল নিজে করেছেন এবং আমাদের শিখিয়ে গেছেন।** ঐ পথ ছাড়া আর কোনো পথে, কোনো প্রক্রিয়ায় তারা আল্লাহর সাহায্য পাবেন না, তারা সফলও হবেন না এবং হচ্ছেন না।

দাজ্জালের রব হবার দাবির বিরুদ্ধে আজ যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি দাঁড়িয়েছে, যাদের দাজ্জাল নাম দিয়েছে 'সন্ত্রাসী', তারা পৃথিবীর কোথাও ঐ মহাশক্তিধর দানবের সাথে পেরে উঠছেন না। **কারণ তাদের জন্য আল্লাহর কোনো সাহায্য নেই।** আল্লাহর সাহায্য নেই তার প্রধান কারণ দু'টো। প্রথমত- তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অর্থ বোঝেন না, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কলেমার ইলাহ শব্দের ভুল অর্থ করেন। তারা ইলাহ শব্দের অর্থ করেন মা'বুদ অর্থাৎ যাকে উপাসনা করা হয়। ইলাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো- যার হুকুম, আদেশ, নির্দেশ শুনতে ও পালন করতে হবে, আনুগত্য করতে হবে অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব। আর মা'বুদ শব্দের প্রচলিত অর্থ হলো- যাকে উপাসনা করা হয়, সেখানে সামগ্রিক জীবনে যার আদেশ নির্দেশ পালন করার, আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই (মা'বুদ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানার

জন্য ‘প্রকৃত ইবাদত’ অধ্যায় দেখুন)। এই ভুল অর্থের পরিণাম আজ এই হয়েছে যে সমস্ত মানবজাতি, এই তথাকথিত ‘মুসলিম’ জনসংখ্যাসহ, মহাসমারোহে বিরাট বিরাট কারুকার্যময় অতি সুদৃশ্য মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জায়, সিনাগগে ও প্যাগোডায় আল্লাহর উপাসনা করে, ইবাদত করে, কিন্তু তাদের সমষ্টিগত জীবনে, আইন-কানুন, দ-বিধি, বিচার ফায়সালায়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে আল্লাহকে, তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে মানুষের সার্বভৌমত্বের আনুগত্য করে, আর দাজ্জাল মানবজাতির কাছে ঠিক এটাই চায়। যে কলেমার ভিত্তির উপর দীনুল হক অর্থাৎ সত্য জীবন-ব্যবস্থার এমারত দাঁড়িয়ে আছে সেই কলেমার ভুল অর্থের আরেক পরিণাম এই হয়েছে যে প্রকৃত, সঠিক ইসলাম আজ হারিয়ে গেছে এবং বর্তমানের ‘লা মা’বুদ ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’ কলেমার **বিকৃত ইসলামটাকেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঐ ক্ষুদ্র দলটি করে যাচ্ছেন, কোথাও সফল হচ্ছেন না এবং হবেনও না** কারণ আল্লাহ বিকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সাহায্য করবেন না। দ্বিতীয়ত- এরা যে ইসলামটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করছেন এবং যে সংগ্রামে তাদের জানমাল উৎসর্গ করছেন সেটা প্রকৃত ইসলামই নয়। শুধু যে প্রকৃত ইসলামই নয় তাই নয়, সেটার আকিদা এবং পথ রসুলের মাধ্যমে প্রেরিত ইসলামের একেবারে বিপরীত।

দাজ্জালকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে সার্বভৌমত্ব কি তা আগে বুঝতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব, কাজেই একটা জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া সে পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। এবং সেই জীবন-ব্যবস্থা হলো দীন। সুতরাং সেই জীবন-ব্যবস্থা বা দীনে আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি, সমাজবিধি, সবই থাকতে হবে। অবশ্য অবশ্যই থাকতে হবে এবং এর একটা সার্বভৌমত্বও অবশ্যই থাকতে হবে; সার্বভৌমত্ব ছাড়া তা চলতেই পারবে না। কারণ যখনই আইন, দ-বিধি অর্থনীতি বা যে কোনো ব্যাপারেই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে তখনই একটা সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন হবে। উদাহরণ- সমাজে অপরাধ দমনের জন্য নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদ- হওয়া উচিত কিনা। কিম্বা সমাজের সম্পদ সঠিক এবং সুষ্ঠু বিতরণের জন্য অর্থনীতি সুদ ভিত্তিক হওয়া সঠিক কিনা? সমাজের নেতারা যদি ঐ সব বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ, যুক্তি-তর্ক করেন তবে তা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে- কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না, কারণ এইসব বিষয়ে প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। একদল বলবেন- নরহত্যার অপরাধে মৃত্যুদ- আইন না করলে সমাজে নরহত্যা থামবে না, বাড়বে; আরেক দলের মত এই হবে যে মৃত্যুদ- বর্বরোচিত, নৃশংসতা, এ কখনো আইন হতে পারে না; আরেক দল হয়তো এই মত দেবেন যে একটি নরহত্যার জন্য মৃত্যুদ- না দিয়ে একাধিক নরহত্যার জন্য মৃত্যুদ- আইন করা হোক। একাধিক অর্থে কয়টি নরহত্যা করলে মৃত্যুদ- দেওয়া হবে, দুইটি না একশ’টি তাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। এবং এ বিতর্ক অনন্তকাল চলতে থাকবে।

অনুরূপভাবে সমাজের অর্থনীতি সুদভিত্তিক হওয়া সঠিক না লাভ লোকসান ভিত্তিক হওয়া উচিত এ নিয়ে বিতর্কের কোনো দিন অবসান হবে না যদি না সিদ্ধান্ত নেবার মতো একটা ব্যবস্থা না থাকে। **কাজেই যে কোনো জীবন-ব্যবস্থায়ই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি স্থান থাকতেই হবে। অন্যথায় জীবন-ব্যবস্থার যে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ আলোচনায় বসলে তা অনন্তকাল চলতে থাকবে।** এই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার ও দেবার কর্তৃত্ব ও অধিকারই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌমত্ব হতে পারে মাত্র দুই প্রকার। যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর, স্রষ্টার; কিম্বা সৃষ্টের অর্থাৎ মানুষের। স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্য একটা জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন যাকে তিনি বলেছেন দীন, সুতরাং তিনি নিজেই সেটার সার্বভৌম। ঐ দীনের মধ্যেই তিনি মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, এক কথায় ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি যে কোনো পর্যায়ে অবিচার, অশান্তি, অন্যায়, অপরাধহীন একটা সমাজ গঠন করে সেখানে বাস করার জন্য তার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যদি স্রষ্টার ঐ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আদেশগুলি মেনে নিয়ে সেই মোতাবেক তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন পরিচালিত করে তবে সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিলো। আর যদি সে আল্লাহর দেয়া সিদ্ধান্তগুলিকে অস্বীকার করে, তবে তাকে অতি অবশ্যই অন্য একটি জীবন-ব্যবস্থা অর্থাৎ দীন তৈরি করে নিতে হবে, কারণ একটা জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে বাস করতে পারে না, তা অসম্ভব। এই নতুন জীবন-ব্যবস্থা তৈরি করতে গেলেই সেখানে অতি অবশ্যই একটি শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, অধিকার থাকতে হবে; এবং যেহেতু স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ করা হলো, সেহেতু এই শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, কর্তৃত্ব অধিকার (Authority) হতে হবে সৃষ্টির অর্থাৎ মানুষের।

সমগ্র মানবজাতি, 'মুসলিম' বলে পরিচিত ১৫০ কোটির এই জনসংখ্যাসহ, আজ স্রষ্টার, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ) ত্যাগ করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করেছে। **এই দুই সার্বভৌমত্ব বিপরীতমুখী, একটি স্রষ্টার, অন্যটি সৃষ্টের; এ দু'টি সাংঘর্ষিক।** আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপরই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, এই সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোনো ইসলাম নেই। আল্লাহর এই সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দাজ্জাল আজ দাঁড়িয়েছে সৃষ্টির অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ, প্রতিনিধি হয়ে। হওয়ার কথা ছিল এই যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসের দাবিদার 'মুসলিম' বলে পরিচিত এই জনসংখ্যা নিজেদের সর্বপ্রকার বিভেদ ভুলে যেয়ে মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি দাজ্জালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। দুর্ভাগ্যক্রমে তা তো হয়ই নাই বরং এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকরকারী, মুসলিম হবার দাবিদার জনসংখ্যার প্রায় সবটাই হয় গণতন্ত্র, না হয় রাজতন্ত্র, না হয় সমাজতন্ত্র, না হয় একনায়কতন্ত্রের কোনো না কোনোটা মেনে নিয়ে দাজ্জালের পায়ে সিজদায় প্রণত হয়ে আছে।

দাজ্জাল, অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা **প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, একাধিকবার দিয়েছে যে সে সমস্ত পৃথিবীতে গণতন্ত্র অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করবে**। এ কাজ সে অনেক আগে আরম্ভ করেছে এবং তা বহুমুখী; পৃথিবীব্যাপী প্রচার মাধ্যমে (Media), শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং শক্তি প্রয়োগ করে। দাজ্জাল ভালো করে জানে যে তার সম্মুখে প্রধান বাধা ইসলাম বলে দীনটি যার বুনিয়াদ, ভিত্তিই হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ্) অর্থাৎ যার সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কারোও সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা। তার সম্মুখে আর কোনো বাধা নেই, কারণ পৃথিবীর বাকি জাতিগুলি মানুষের সার্বভৌমত্বকে ইতোমধ্যেই মেনে নিয়েছে। প্রচার (Media) ও শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে মুসলিম বলে পরিচিত এ জনসংখ্যার নেতৃত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ দাজ্জালের পায়ে সিজদায় প্রণত হয়ে গেছে। বাকি শুধু একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা যারা দাজ্জালকে 'দাজ্জাল' বলে না বুঝেও শুধু সে মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাকে তার হুকুমের দাসে পরিণত করার চেষ্টা করছে, এইটুকুর জন্য এই মহাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

দাজ্জালের ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে আছে বিরাট বিশাল সামরিক শক্তি, এবং আছে প্রভূত পার্থিব সম্পদ। দাজ্জালবিরোধী এই ক্ষুদ্র সংখ্যার কাছে ওসব কিছুই নেই, তাদের পার্থিব সম্পদ, তেল গ্যাস ইত্যাদিও তাদের হাতে নেই, সেগুলো তাদের সরকারগুলোর হাতে, যারা ইতোমধ্যেই দাজ্জালের পায়ে সিজদায় প্রণত হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কার্যত অস্বীকার করে দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্বকে তাদের ইলাহ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং মরিয়া হয়ে তারা ভুল কাজ করছেন। তারা এখানে ওখানে বোমা ফাটাচ্ছেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করছেন। তাতে দাজ্জালের কোনো ক্ষতি না হওয়ায় তারা শরীরে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী হচ্ছেন। এতে দাজ্জালের কী ক্ষতি হয়েছে? ধরতে গেলে কিছুই না। টুইন টাওয়ার গেছে তাতে দাজ্জালের কী হয়েছে? এখন ঐ স্থানেই সেই টুইন টাওয়ারের চেয়েও বড় টাওয়ার তৈরি করছে। বরং দাজ্জালের এতে লাভ হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষকে সে বলছে যে- দ্যাখো! এরা কি রকম সন্ত্রাসী। এরা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ, স্ত্রীলোক, শিশু হত্যা করছে আত্মঘাতী বোমা মেরে। এদের ধর, মার, জেলে দাও, ফাঁসি দাও। পৃথিবী দাজ্জালের এ কথা মেনে নিয়েছে এবং দাজ্জালের নির্দেশ মোতাবেক তাই করছে, কারণ ইংরেজি প্রবাদ বাক্য Might is right অর্থাৎ মহাশক্তিধরের কথাই ঠিক।

এ প্রবাদ বাক্য যে সত্য তা এ থেকেই প্রমাণ হয় যে পৃথিবীর মানুষ টুইন টাওয়ারের দুই আড়াই হাজার মানুষ হত্যার জন্য দাজ্জালের আখ্যায়িত 'সন্ত্রাসীদের' ঘৃণা করে, কিন্তু হিরোশিমা নাগাসাকির কয়েক লক্ষ নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হত্যার জন্য দাজ্জালকে ঘৃণা তো করেই না বরং তার পায়ে সিজদায় প্রণত হয়ে আছে, তার একটু কৃপা পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে। টুইন-টাওয়ারে শুধু কার্যক্ষম নর-নারী ছিল, কিন্তু নাগাসাকি হিরোশিমাতে নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, পঙ্গু,

বিকলাঙ্গ, হাসপাতাল ভর্তি রোগী, স্কুল, কলেজ, সবই ছিল এবং ঐ সবই দাজ্জাল এটম বোমা মেরে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে দাজ্জাল (তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নও মানুষের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী) আফগানিস্তানে এবং ইরাকে প্রায় প্রতিদিন বেসামরিক মানুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পঙ্গু, রোগী হত্যা করে চলেছে। এগুলোর মোট সংখ্যা 'সন্ত্রাসীদের' বোমা এবং আত্মঘাতী হামলায় বেসামরিক নর নারী শিশুর হত্যার সংখ্যার হাজার গুণ বেশী। এ কাজের জন্য কেউ দাজ্জালকে সন্ত্রাসী বলে না, তাকে ঘৃণাও করে না, তার তাবেদারি করতে পারলে গদ গদ চিত্ত হয়ে যায়। কেন? ঐ প্রবাদ বাক্য- Might is right, শক্তিই হলো ন্যায়-অন্যায়ের মানদ-।

মহাসত্য হচ্ছে এই যে- আল্লাহর রসুলের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন হচ্ছে এই যে, দাজ্জাল হচ্ছে বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা, তার বাহন হচ্ছে যান্ত্রিক প্রযুক্তি (Scientific Technology), যে বাহনের হাতে, শরীরে অজস্র যুদ্ধাস্ত্র, বোমারু বিমান, যুদ্ধ-জাহাজ, ট্যাঙ্ক, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং আণবিক বোমা ইত্যাদি। এই অস্ত্রের শক্তিতে মহাশক্তিধর হয়ে সে মানবজাতিকে বলছে, তোমরা আমাকে প্রভু (রব) বলে স্বীকার করো, আমার আদেশ পালন করো, এবং তোমরা স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ্) ত্যাগ করে মানুষের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করো। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অনেক পুরানো ব্যাপার, ওটা অকেজো হয়ে গেছে। তবুও তোমরা যার যার ধর্ম পালন করো কোনো সমস্যা নেই। মুসলমান, তোমরা যত খুশি লম্বা দাড়ি রেখে, মোছ কেটে ফেলে, পাজামা হাঁটু পর্যন্ত টেনে উঠিয়ে মসজিদে দৌড়াও, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামায পড়ো, আমার কোনো আপত্তি নেই; খ্রিষ্টান, তুমি লম্বা জোব্বা পোরে, গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে, গীর্জায় যেয়ে যত খুশি নীতিবাক্য, বক্তৃ তা করতে চাও করো, আমার কোনো আপত্তি নেই; বৌদ্ধ, তুমি গেরুয়া বসন গায়ে দিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে, ভিক্ষা করে খাবার সংগ্রহ করে প্যাগোডায় যেয়ে বুদ্ধের মূর্তির সামনে বসে যত খুশি 'বুদ্ধং স্বরণং গচ্ছামী, সংঘং স্বরণং গচ্ছামী' গাও কোনো আপত্তি নেই; হিন্দু, তুমি নামাবলি গায়ে দিয়ে কপালে সিঁদুর আর চন্দনের ফোটা দিয়ে তোমাদের হাজারো রকম মন্দিরের যেটায় খুশি যেয়ে হাজারো রকম মূর্তির সামনে বসে ঘণ্টা বাজাও, কোনো আপত্তি নেই; ইহুদি, তোমরা লম্বা আলখালা গায়ে দিয়ে মাথায় উঁচু টুপি পোরে, বুকে ডেভিডের স্টার ঝুলিয়ে সিনাগগে যেয়ে প্রার্থনা করো, কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি তো নেইই, বরং এগুলো তোমরা যত বেশি করবে আমি তত খুশি হবো; কারণ তোমরা ওগুলো নিয়ে যত বেশি ব্যস্ত থাকবে আমি তত নিরাপদ হবো।

কিন্তু সাবধান! কখনো সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলো না, ও ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে। আমি মানবজাতিকে বাধ্য করেছি আমাকে প্রভু (রব) বলে মেনে নিতে; অর্থাৎ আমার উপদেশ মেনে নিতে। আমার উপদেশই আমার আদেশ।

এবং তাদের সামষ্টিক জীবনে অর্থাৎ রাষ্ট্র, আর্থ-সামাজিক জীবনে মানুষকে সার্বভৌম (ইলাহ) বলে মেনে নিতে বাধ্য করেছি। যদি কোনো ব্যক্তি বা দল আমার উপদেশ অর্থাৎ আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তবে সেই ব্যক্তি বা দল যেই রাষ্ট্রের বাসিন্দা সেই রাষ্ট্রের সরকারকে আমার অসন্তুষ্টি জানিয়ে দিলেই আমার মেজাজ খুশি রাখার জন্য সেই রাষ্ট্রের সরকার তার সর্বশক্তি নিয়ে সেই ব্যক্তি বা দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে ধ্বংস করে দেয়; আমার কিছুই করতে হয় না। আর যদি কোনো রাষ্ট্র আমার আদেশ মানতে গড়িমসি করে বা অমান্যই করে তবে প্রথমত আমি সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanction) আরোপ করি। যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রই আমার প্রভুত্বকে (রবুবিয়াহ) ও মানুষের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে, সেহেতু তারা আমার উপদেশ (আদেশ) অনুযায়ী সে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে প্রচ- অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাতে যদি কাজ না হয় তবে আমি সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবরোধ (Embargo) স্থাপন করি। বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সেটার সমস্ত রকম সম্পর্ক কেটে দিয়ে সেটাকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে দেই।

এতেও যদি সে রাষ্ট্র আমার প্রভুত্ব ও মানুষের সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পণ না করে তবে আমি সেটাকে সামরিকভাবে আক্রমণ করে সে রাষ্ট্র দখল করে নিয়ে সেখানে আমার আনুগত্য ও মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকারকারী সরকার স্থাপন করি। এই প্রক্রিয়ায় ঐ রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, কামানের হামলায় নিহত হয়। কোটি কোটি শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পঙ্গু, বিকলাঙ্গ হয়। সে দেশের সমস্ত স্থাপনা ধ্বংস হয়। এ সত্ত্বেও আমাকে তা করতে হবে কারণ সমস্ত পৃথিবীতে আমার প্রভুত্ব (রবুবিয়াহ) ও স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে (উলুহিয়াহ্) হটিয়ে মানুষের সমষ্টিগত জীবনে মানুষেরই সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা আমার অঙ্গীকার, আমার ক্রুসেড (Crusade)। এ ক্রুসেডে আমি ইতোমধ্যেই সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে বিশ্বজয়ী হয়েছি। মানুষের সার্বভৌমত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ) আর কোথাও নেই। কিন্তু আমার প্রভুত্বকে (রবুবিয়াহ) এখনো কিছু কিছু রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। তাদের মধ্যে দু'টি রাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ও পরে অবরোধ করেও বাগ মানাতে না পেরে তাদের সামরিকভাবে আক্রমণ করে পরাজিত করে আমার অবাধ্য সরকার ভাগিয়ে দিয়ে সেখানে আমার একান্ত অনুগত সরকার ক্ষমতায় বসিয়েছি। আরও যদি কোনো রাষ্ট্র আমার প্রভুত্ব মানতে রাজি না হয় তবে তাদেরও দশা ঐ দুই রাষ্ট্রের মতই হবে।

দাজ্জালের এই দাবি, এই হুকুমের বিরুদ্ধে বলার বিশেষ কিছুই নেই। বাস্তবতাকে (Reality) স্বীকার করে নিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে স্রষ্টা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও মানুষের সার্বভৌমত্বের দ্বন্দ্বে ইতোমধ্যেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব পরাজিত হয়ে গেছে। কারণ অতি সরল- যার সঙ্গে দাজ্জালের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের রক্ষাকারী মুসলিম বলে পরিচিত জনসংখ্যাটি,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' **কলেমার ভুল অর্থ করে ইলাহ শব্দের অর্থকে একমাত্র হুকুমদাতার বদলে একমাত্র উপাস্য বলে রূপান্তর করে** সমষ্টিগত, জাতীয় জীবনে আল্লাহর প্রতিটি আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আদেশ প্রতিপালন করে, পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ চাকচিক্যময় মসজিদ তৈরি করে তাতে মহা-ধুমধাম করে ইবাদত করে দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তার পক্ষ হয়ে গেছে। এই জনসংখ্যাটি যে এমন করবে তা আল্লাহর রসুল বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন (পরিচিতি অধ্যায় ১২ নং হাদিস এবং ঐ অধ্যায়ের শেষে ক এবং খ হাদিস), এমন কি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র ও তাঁর নবীর মদিনার অভিভাবক রাজশক্তিটি পর্যন্ত দাজ্জালের পায়ে সিজদায় অবনত হয়ে গেছে, তার আদেশ প্রাণপণে পালন করে চলেছে। না করলে দাজ্জালের আদেশে তার সিংহাসন হারাবার ভয় আছে। অনুরূপ অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলি রাজতন্ত্র ও আমিরতন্ত্রের। এ তন্ত্রগুলিও মানুষের সার্বভৌমত্বের অঙ্গীভূত। এরা সব এখন দাজ্জালের শক্তি বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ। এর বাইরে যে মুসলিম নামের জনসংখ্যা রয়েছে সেগুলির শাসকশ্রেণি মানুষের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী অর্থাৎ দাজ্জালের অনুসারী।

তাহলে কি সব আশাই শেষ? না; তা নয়। তা যে নয় তার কয়েকটি কারণ আছে। **প্রথম কারণ হলো** এই যে, আল্লাহ তাঁর কোর'আনে তাঁর শেষ রসুলকে রহমাতুল্লিল আ'লামিন বলেছেন (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)। অর্থাৎ শেষ নবী মোহাম্মদ (দ.) সমস মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত রহমত। যারা তাঁকে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত দীন, জীবন-ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সেটাকে তাদের জীবনে কার্যকর করবে শুধু তাদের জন্যই তিনি আল্লাহর রহমত। আল্লাহ বলেছেন তিনি তাঁর রসুলকে সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন- কাজেই এক সময় সমস্ত মানবজাতি তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে পাওয়া দীনুল হক (সঠিক জীবন-ব্যবস্থা) তাদের জীবনে কার্যকর, প্রতিষ্ঠা করবে। তা না হলে আল্লাহর দেয়া রহমাতুল্লিল আ'লামিন উপাধি অর্থহীন হয়ে যায়। তা অসম্ভব।

দ্বিতীয় কারণ- আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন- আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুয়াত থাকবে (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং)। তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর হবে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত; যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে, তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে মুলকান (রাজতন্ত্র); যতদিন আল্লাহ চান ততদিন থাকবে, তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে জাবারিয়াত (শক্তি প্রয়োগ, জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন)। তারপর আসবে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত (দালায়েলুম নবুয়াত- বায়হাকী, মুসনাদ- আহমদ বিন হাম্বল, মেশকাত)। রসুলাল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশ নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ তো বিতর্কের বাইরে। তারপর তৃতীয় অংশ ইতিহাস। উমাইয়া যুগে খেলাফতের পদ্ধতি বদলিয়ে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো, যদিও রাজনৈতিক কারণে ও মানুষকে ধোঁকা

দেওয়ার জন্য নাম খেলাফতই রইল। সমস্ত পৃথিবীতেই তখন রাজতন্ত্র চালু ছিল; ইসলামের খেলাফত তখন তাদের সামিল হয়ে গেল। পৃথিবীময় ঐ রাজতন্ত্র চলল কয়েক শতাব্দী। তারপর ৪৮১ বছর আগে দাজ্জালের জন্ম হবার পর ধীরে ধীরে পৃথিবীর রাজতন্ত্রগুলি লোপ পেয়ে সেখানে দাজ্জালের অনুসারী বিভিন্ন তন্ত্র, বাদ, ইযম্ (-ism), ক্রেসি (-cracy) ইত্যাদি আসীন হলো। আরম্ভ হলো রসুল বর্ণিত জাবারিয়াত, শক্তির শাসন, Might is right-এর শাসন, দাজ্জালের শাসন এবং এখন এটাই চলছে। সুসংবাদ এই যে এর অবসান ঘটবে এবং এর পর **এনশা'আল্লাহ আসছে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত।** এবং সেটা আসছে ঈসার (আ.) হাতে দাজ্জালের ধ্বংসের পর।

তৃতীয় কারণ- আল্লাহর রসুল একদিন বললেন- সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও। আমার উম্মাহর উদাহরণ এমন এক বৃষ্টির মত, যার প্রথম ভালো না শেষ ভালো বলা যায় না। ... এই উম্মাহ ধ্বংস হবে কেমন করে যার প্রথমে আমি, মধ্যে মাহদী এবং শেষে ঈসা; **কিন্তু এর মধ্যখানে আছে বিভ্রান্তরা; তারা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই** (হাদিস- আনাস (রা.) থেকে তিরমিযি; জাফর (রা.) থেকে রাযিন)।

আল্লাহর রসুলের এই কথা থেকে বোঝা যায় যে আখেরী যামানায়, শেষ যুগে, বাইবেলের ভাষায় Last hour-এ এই উম্মাহর মানুষ আবার এমন মানুষে পরিণত হবে যারা রসুলের যুগের মানুষের মতই হবে। এবং এই উম্মাহর দুই প্রান্তের মানুষের এমনই মিল হবে যে উম্মাহর স্রষ্টা স্বয়ং রসুলের পক্ষেই বলা মুশকিল হবে কোন্টা ভালো। শোকর আলহামদোলেল্লাহ। আল্লাহর রসুলের এই হাদিস থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আরেকটি সত্য, যে সত্যটি আমরা অর্থাৎ হেযবুত তওহীদ বারবার বলে আসছি এবং সত্যটি বলার জন্য, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টার জন্য আমরা প্রচ- বাধার সম্মুখীন হচ্ছি, বিশেষ করে বর্তমান বিকৃত ইসলামের আলেম শ্রেণির কাছ থেকে অপমানিত হচ্ছি, নিগৃহিত হচ্ছি; সে সত্য হচ্ছে এই যে আল্লাহর রসুলের ৬০/৭০ বছর পর থেকে ভবিষ্যতে মাহদী (আ.) পর্যন্ত যে সময় অর্থাৎ বর্তমানের মুসলিম নামধারী এই জনসংখ্যা রসুলের কেউ নয়, এবং রসুলও তাদের কেউ নন। আল্লাহর রসুল যাদের কেউ নন, এবং যারা রসুলের কেউ নয় তারা কি মুসলিম বা মো'মেন বা উম্মতে মোহাম্মদী? অবশ্যই নয়। এই জন্য নয় যে রসুল ও মাহদীর অন্তর্বর্তীকালীন মুসলিম নামধারী বর্তমানের এই জনসংখ্যাটি আল্লাহর অস্তিত্বকে, তাঁর একত্বকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাঁর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে দাজ্জালের অর্থাৎ জুডিও-খ্রিষ্টান সভ্যতার, যে সভ্যতার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর নয়, মানুষের, তা মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করছে।

ঠিক এই অবস্থা ছিল আরবের মানুষের চৌদ্দশ' বছর আগে যখন আল্লাহ তাঁর রসুলকে সেখানে পাঠালেন। তখনকার ঐ আরবরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে তেমনি বিশ্বাস করতো যেমন আজ আমরা করি; তিনি যে স্রষ্টা, প্রতিপালক, সব

কিছুর নিয়ামক, তিনি যে সর্বশক্তিমান এ সব কিছুই তারা বিশ্বাস করতো (সুরা যুখরুফ, আয়াত ৯; সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬১ ও ৬৩; সুরা লোকমান, আয়াত ২৫)। তারা ইবরাহীমকে (আ.) আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করতো; নিজেদের মিল্লাতে ইবরাহীম বলে বিশ্বাস করতো; ইবরাহীম (আ.) দ্বারা পুনর্নির্মিত কাবাকে আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করতো; কাবার দিকে মুখ করে ইবরাহীমের (আ.) শেখানো পদ্ধতিতে সালাহ (নামায) কায়েম করতো; কাবাকে কেন্দ্র করে বছরে একবার হজ করতো; কাবা তওয়াফ (পরিক্রমা) করতো; সেখানে যেয়ে আল্লাহর রাস্তায় পশু কোরবানি করতো; বছরে একমাস, রমাদান মাসে সওম (রোযা) পালন করতো; এমন কি প্রত্যেকে এবরাহীমের (আ.) শেখানো খাত্না করতো। তারা প্রতি কাজে আল্লাহর নাম নিতো, দলিল ইত্যাদি লিখতে, বিয়ে-শাদীর কাবিন লিখতে তারা প্রথমেই ওপরে আল্লাহর নাম লিখে আরম্ভ করতো। আমরা যেমন এখন লেখি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তারা লেখতো বেসমেকা আল্লাহুম্মা; একই অর্থ। তাহলে যাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আসলেন তাদের সাথে বর্তমানের মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যার তফাৎ কোথায়? যদি বলেন যে তারা মূর্তিপূজা করতো তবে তার জবাব হচ্ছে এই যে ঐ মোশরেক আরবরা ঐ মূর্তিগুলোকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করতো না, তাদের স্রষ্টা বলেও বিশ্বাস করতো না, তাদের প্রভু (রব) বলেও বিশ্বাস করতো না। একটু আগেই কোর'আনের যে আয়াতগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছি যেগুলোয় আল্লাহ তাঁর রসুলকে বলছেন তাদের প্রশ্ন করতে, মোশরেকদের জবাব থেকেই, যে জবাবগুলি আল্লাহ স্বয়ং দিচ্ছেন মোশরেকদের পক্ষ থেকে তা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তাহলে আরবদের কাছে ঐ মূর্তিগুলি কী ছিল? তাদের কাছে ঐ মূর্তিগুলি আল্লাহ ছিল না, তারা বিশ্বাস করতো ওগুলি আল্লাহর নিকটবর্তী, ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়জন। তারা ওগুলির পূজা করতো দু'টো কারণে- এক) যেহেতু ওগুলো আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সেহেতু তারা পূজারীদের পক্ষ হয়ে কোনো ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করলে আল্লাহ তা মঞ্জুর করবেন। যেমন রোগ-শোক থেকে মুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য, কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার ইত্যাদি। এ কথার প্রমাণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ বলছেন- তারা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী' (সুরা ইউনুস, আয়াত ১৮)। দুই) তারা বিশ্বাস করতো যে যেহেতু ঐ মূর্তিগুলি, ঐ দেব-দেবীগুলি আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় কাজেই তাদের পূজা করে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তারা পূজারীদের আল্লাহর সান্নিধ্য (কুরবিয়াহ্) এনে দেবে। এ ব্যাপারেও আল্লাহ বলেছেন- যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে'(সুরা যুমার, আয়াত ৩)। দেখা যাচ্ছে- আরব মোশরেকদের মূর্তিপূজার পেছনে দু'টো উদ্দেশ্য

ছিল, একটি দুনিয়াদারী, অন্যটি আখেরাত। ঐ মূর্তিগুলিকে আরবের মোশরেকরা কখনই আল্লাহর স্থানে বসায় নাই।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে- আজ মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটি (কোনো উম্মাহ নয়) যে দীনটাকে পালন করে নিজেদের মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে বিশ্বাস করে এবং মৃত্যুর পর জান্নাতে অর্থাৎ বেহেশতে যাবার আশা করে ঐ জনসংখ্যাটি এবং আরবের ঐ মোশরেকদের জাতিটি যার মধ্যে তাদের হেদায়াহর জন্য আল্লাহ তাঁর রসুল প্রেরণ করলেন এ দু'টোর মধ্যে প্রভেদ কোথায়? কথাটা আরও পরিষ্কার করছি। বর্তমানের এই দীন পাঁচটি রোকনের (স্তম্ভ) ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এ কথায় কোনো সন্দেহ আছে কি? অবশ্যই নয়; এবং সেগুলি হলো- ১) কলেমা, ২) সালাহ (নামায), ৩) যাকাহ, ৪) হজ, ৫) সওম (রোযা)। যারা এগুলির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ওগুলি পালন করেন তাদের বলা হয় মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী। এখন দেখা যাক তদানীন্তন আরবদের সাথে অমিল কোথায়।

১) **কলেমা**। বর্তমানের এই মুসলিম বলে পরিচিত জনসংখ্যা বিশ্বাস করে আল্লাহ এক, তিনি উপাস্য, তিনি স্রষ্টা, তিনি রক্ষাকর্তা, তিনি রব অর্থাৎ ভরণ-পোষণকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। ঐ সময়ের আরবরাও ঠিক এই কথাই বিশ্বাস করতো। কোর'আনে আল্লাহ নিজে এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন (সুরা যুখরুফ, আয়াত ৯; সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬১ ও ৬৩; সুরা লোকমান, আয়াত ২৫)।

২) **সালাহ (নামায)**। মুসলিম বলে পরিচিত বর্তমানের এই জনসংখ্যার মতো ঐ মোশরেক আরবরাও আল্লাহর ঘর কাবার দিকে মুখ করে সালাহ কায়েম করতো এ কথা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের ক্রীতদাস, পরে মুক্ত ও তাঁর সন্তান হিসাবে গৃহীত যায়েদকে (রা.) খুঁজতে খুঁজতে তার বাপ-চাচারা যখন শুনতে পেলেন যে যায়েদ (রা.) মক্কায় মোহাম্মদ (দ.) নামের একজন লোকের কাছে আছে যিনি আল্লাহর নবী হবার দাবি করছেন। এ খবর শুনে তারা উত্তর আরব থেকে মক্কায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন- আমরা মোহাম্মদ (দ.) নামের একজন লোককে খুঁজছি, তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে। লোকজন বললো- নামাযের সময় কাবায় যাবেন, দেখবেন একজন লোক অন্য সব নামাযী থেকে বিচ্ছিন্ন, আলাদা হয়ে একা নামায পড়ছেন, তিনিই আপনারা যাকে খুঁজছেন তিনি, মোহাম্মদ (দ.); অর্থাৎ মক্কার মোশরেকরা কাবার দিকে মুখ করে জামাতে সালাহ (নামায) কায়েম করতো। অবশ্য ঐ সালাহ আল্লাহর নবী এবরাহীমের (আ.) শেখানো পদ্ধতির ছিল, শেষ রসুলাল্লাহর পদ্ধতিতে ছিল না। বর্তমানের সালাতের এই নিয়ম পদ্ধতি পরে এসেছে।

৩) **যাকাহ**। যে উদ্দেশ্যে যাকাহ দেওয়া অর্থাৎ নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে সমাজের অন্য দুঃস্থ, গরিব বা অন্যের প্রয়োজন পূর্ণ করতে সাহায্য দেয়া সে

অর্থে ঐ মোশরেকরাও তাদের উপার্জিত সম্পদ থেকে বহু দান-খয়রাত করতো, এটাও ইতিহাস। তাদের মধ্যে হাতেম তাঈ'র মতো আরো অনেক দানশীল ছিল। আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে সেই অনিয়মিত, ইচ্ছাকৃত দানকে একটা শৃঙ্খলার (Discipline) মধ্যে এনে এটাকে শতকরা আড়াই (২ ১/২) ভাগে নিবন্ধন করেছেন।

৪) **হজ**। এ কথা ইতিহাস যে তদানীন্তন মোশরেক আরবরা বছরে একবার কাবাকে কেন্দ্র করে হজ পালন করতো। তাদের ঐ হজ্বের সময়, মাস, তারিখ, নিয়ম কানুন প্রায় বর্তমানের হজ্বের মতই ছিল।

৫) **সওম (রোযা)**। তখনকার মোশরেকরাও বর্তমানের দীনের মতই রমাদান মাসেই একমাস সওম (রোযা) পালন করতো। ঐ মোশরেক আরবদের সাথে তাহলে বর্তমানের মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যার তফাৎ কী এবং কোথায়? ঐ আরবদের মধ্যে যদি রসুল পাঠানোর প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে এখনকার এই জনসংখ্যার অবস্থা কী?

উত্তর হচ্ছে- অতসব ইবাদত সত্ত্বেও, আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস (ঈমান) থাকা সত্ত্বেও, কাবাকে আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও, কাবার দিকে মুখ করে সালাহ (নামায) কায়েম করা সত্ত্বেও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীন দরিদ্রের জন্য দান-খয়রাত (যাকাতের মত) করা সত্ত্বেও, প্রতি বছর কাবা কেন্দ্রিক হজ করা সত্ত্বেও, রমাদান মাসে সওম (রোযা) করা সত্ত্বেও, এমন কি প্রত্যেকে খাত্না করা সত্ত্বেও **ঐ আরবরা মোশরেক ছিল, কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছিল না**। তাদের সার্বভৌম, ইলাহ ছিল কাবা ঘরের অভিভাবক, কোরায়েশরা। তাদের দীন ছিল কোরায়েশরা যে সিদ্ধান্ত দেবে তা পালন করা। আজ যেমন এই জাতির ইলাহ হলো দাজ্জাল। এবং দীন হলো মানবরচিত জীবন-ব্যবস্থা, তন্ত্র, মন্ত্র, বাদ, ক্র্যাসি ইত্যাদি।

বর্তমানের মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যা ঐ মোশরেক আরবদের মতই আল্লাহর অস্তিত্বে, একত্বে বিশ্বাসী, সালাহ (নামায) কায়েম করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-খয়রাত (যাকাহ) করে, বছরে একবার হজ করে, কাবা তওয়াফ করে, রমাদান মাসে সওম (রোযা) রাখে এবং খাতনা করে কিন্তু ঐ আরবদের মতই এ জনসংখ্যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করে মানুষের সিদ্ধান্ত পালন করছে তাদের জাতীয় জীবনে। **এই পথভ্রষ্টতার সাংঘাতিক ভুলের একমাত্র কারণ হচ্ছে কলেমার, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ইলাহ শব্দের অর্থকে বদলিয়ে মা'বুদ অর্থাৎ উপাস্য করা**। অর্থাৎ আল্লাহ একমাত্র 'আদেশদাতা, সার্বভৌম' থেকে বদলিয়ে একমাত্র 'উপাস্যে' পরিণত করা যা আরবের মোশরেকরা করেছিল এবং তা করে তাদের সমস্ত ইবাদত সত্ত্বেও মোশরেক হয়ে গিয়েছিল। এবং এ জন্যই আল্লাহ তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সার্বভৌমত্বকে আবার প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাই তাঁর রসুল এসে সাফা পাহাড়ে

দাঁড়িয়ে মক্কার সমস্ত মানুষকে ডেকে এনে প্রথমেই বলেছিলেন- বল (বিশ্বাস কর) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ যদি আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ অর্থাৎ উপাস্য হয় তবে রসুলাল্লাহর ঐ ডাক অর্থহীন কারণ ঐ মোশরেকরা নামায পড়ে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, হজ করে ও রমাদানের রোযা রেখে আল্লাহর উপাসক হয়েই ছিল, তাদের আবার আল্লাহকে উপাস্য মা'বুদ বলে বিশ্বাস করার জন্য ডাক দেবার প্রয়োজন কি? আরবের এ মোশরেকরা কি নামায, দান-খয়রাত, হজ, রোযা এগুলি ঐ দেবদেবীর উদ্দেশ্যে করতো? অবশ্যই নয়- তারা আল্লাহর ইবাদত হিসাবে করতো। মোশরেকরা কি উদ্দেশ্যে দেব-দেবীর পূজা করতো তা আল্লাহ নিজে তাঁর কোর'আনে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন (সুরা যুমার, আয়াত ৩; সুরা ইউনুস, আয়াত ১৮)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আদম (আ.) থেকে শুরু করে আল্লাহর শেষ রসুল পর্যন্ত যত নবী-রসুল পৃথিবীতে এসেছেন এবং শেষ রসুল সাফায় উঠে সমবেত মানুষকে যে ডাক দিলেন সেটা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আদেশদাতা নেই', 'লা মা'বুদ ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই' নয়**। আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত কোনো নবী অন্য কোনো কলেমা নিয়ে আসেন নাই। আল্লাহর শেষ কেতাব কোর'আনে **একটিবারের জন্যও লা মা'বুদ ইল্লাল্লাহ নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই এটা অতি সত্য কিন্তু সেটা কলেমা নয়, এ দীনের ভিত্তি নয়,** এ কলেমা পাঠ করে অন্য দীনের কোনো মানুষ এই দীনে প্রবেশ করতে পারবে না। এ দীনে প্রবেশ করতে হলে তাকে যে কালেমটা অবশ্যই মুখে উচ্চারণ করতে হবে, অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং কাজে পরিণত করতে হবে সেটা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আদেশদাতা নেই। হুকুমদাতা, আদেশদাতা আদেশ করলে তবে তো ইবাদত, আদেশ করেছেন বলেই তো ইবাদত করা হয়, আদেশ না করলে তো ইবাদত করতে হতো না, সুতরাং **আদেশ আগে, আদেশ পালন অর্থাৎ ইবাদত পরে** (বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত, অকপট হয়ে তাঁর ইবাদত করতে।' (সুরা যুমার, আয়াত ১১)); ইলাহ আগে, মা'বুদ পরে। ইলাহ এবং মা'বুদ দু'টি আল্লাদা শব্দ, ভিন্ন অর্থ।

দীনুল হকের, ইসলামের কলেমার অনুবাদের এবং সেই ভুল অনুবাদকে বিশ্বাস করার ফল কি হয়েছে? ফল এই হয়েছে যে মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটি আল্লাহর ইবাদত করার জন্য পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ সুদৃশ্য, জাক-জমকপূর্ণ মসজিদ তৈরি করে সালাহ (নামায) পড়ছে, যাকাহ দিচ্ছে, হজ করছে, রোযা রাখছে, এবং এছাড়াও বহু রকম নফল ইবাদতও করছে, ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর নির্দিষ্ট কিছু আদেশও পালন করছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের ব্যাপারে আল্লাহ যে আদেশ নিষেধ করেছেন তা মানছেনা, পালনও করছে না, প্রত্যাখ্যান করছে অর্থাৎ আল্লাহকে ইলাহ বলে মানছে না, মা'বুদ বলে মানছে। জাতীয় জীবনের ব্যাপারে

এ জনসংখ্যা জুডিও-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক জড়বাদী সভ্যতার আনুগত্য করছে অর্থাৎ দাজ্জালের অনুগত হয়ে গেছে, দাজ্জালও তাই চায়। এ কাজ করে তারা এ দীনের ভিত্তি, কলেমা থেকেও বের হয়ে গেছে। আল্লাহর শেষ নবী এসে আল্লাহর যে সার্বভৌমত্বকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন সেই সার্বভৌমত্ব মানুষ আবার বিসর্জন দিয়ে মানুষের, দাজ্জালের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করেছে, দাজ্জালের পায়ে সিজদায় প্রণত হয়েছে।

তার উম্মাহ যে এই কাজটি করবে তা আল্লাহর রসুল জানতেন, আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন- তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন- তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ অনুকরণ করবে, এমন কি তারা যদি সরীসৃপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরা তাও করবে। নবীকে প্রশ্ন করা হলো- হে আল্লাহর রসুল! (যাদের অনুসরণ করা হবে) **তারা কি ইহুদি ও খ্রিষ্টান? তিনি জবাব দিলেন- আর কারা** (হাদিস- আবু সাঈদ (রা.) থেকে- বুখারী, মুসলিম ও মেশকাত)**?** তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ও মাহদীর (আ.) মধ্যবর্তী বর্তমানের এই জনসংখ্যা সম্বন্ধে কেন বলেছেন যে তারা তাঁর কেউ নয়, তিনিও তাদের কেউ নন। আনাস (রা.) থেকে তিরমিযি ও জাফর (রা.) এ থেকে রাযিনের এই সহিহ হাদিস থেকে আমরা নিশ্চিত সুসংবাদ পাচ্ছি যে তিনি থেকে মাহদী (আ.) পর্যন্ত মুসলিম নামধারী জনসংখ্যাটি প্রকৃতপক্ষে (De Facto) মোশরেক ও কাফেরে পর্যবসিত হলেও তাঁর উম্মাহ ধ্বংস হবে না; **আবার এনশাল্লাহ এই বিভ্রান্ত জনসংখ্যার মানুষ থেকে এমন মানুষ জন্মাবে** যারা এমনভাবে রসুলাল্লাহর নিজের হাতের গড়া উম্মাহর মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর মতো হবে যে তাঁর নিজের পক্ষেই বলা মুশকিল হবে যে তারাই ভালো নাকি ঐ শেষের এরা ভালো। শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

চতুর্থ কারণ- একদিন বিশিষ্ট সাহাবা আবু ওবায়দা (রা.) আল্লাহর রসুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা যারা আপনার সঙ্গে থেকে কঠিন জেহাদ কোরলাম, আমাদের চেয়ে ভালো লোক কি আর হবে? আল্লাহর রসুল জবাব দিলেন- আখেরী যামানায় এমন লোক আবির্ভূত হবে যাদের অবস্থান (দরজা) তোমাদের চেয়েও বহুগুণ ঊর্ধে হবে। বিস্মিত আবু ওবায়দা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন- কি জন্য তাদের দরজা এত উন্নত হবে? জবাবে আল্লাহর রসুল বললেন- আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তাদের সঙ্গে থাকবো না (হাদিস- আবু ওবায়দা (রা.) থেকে- আহমদ মেশকাত)। একটু খেয়াল করলে এই হাদিসটির মধ্যে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত: প্রশ্ন করছেন কে? তিনি আর কেউ নন- আবু ওবায়দা (রা.) যিনি এমন মানুষ ছিলেন যাকে আল্লাহর নবী তাঁর নিজের উপাধি আল-আমিন দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আবু ওবায়দাকে (রা.) উপাধি দিয়েছিলেন- আমিন উল মিল্লাত, মিল্লাতের আমিন, যিনি ওহোদের যুদ্ধে আল্লাহর রসুল আহত হবার পর তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণের পেরেক ঢুকে যাওয়ায় সে পেরেক কামড়িয়ে বের

করার চেষ্টায় নিজের একাধিক দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। যিনি আল্লাহর রসুলের পরে উম্মতে মোহাম্মদীর জেহাদের আমির (Commander) হয়ে উত্তর ইরাকের অধিকাংশ এলাকা দখলে এনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত: আবু ওবায়দা (রা.) কী বলছেন- তিনি বলেছেন, আমরা যারা আপনার সঙ্গে থেকে কঠিন জেহাদ, সংগ্রাম কোরলাম। এ প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবারা এ দীনের কোন্ কাজটাকে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। আবু ওবায়দা (রা.) এ কথা বললেন না যে, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা যারা আপনার সাথে থেকে সালাহ (নামায) কায়েম কোরলাম, আপনার সাথে সওম রাখলাম, হজ করলাম, যাকাহ দিলাম, অন্যান্য অনেক ওয়াজেব, নফল ইবাদতও করলাম। তিনি এসবের একটাও উল্লেখ করলেন না যেগুলি নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত আছি, তিনি জেহাদের কথা বললেন- যেটা আমরা শুধু ত্যাগ করি নাই, একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ভুলেই গেছি। শুধু তাই নয়, উম্মতে মোহাম্মদী বলে পরিচিত এ জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এর বিরোধী। আবু ওবায়দার (রা.) এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় **যে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবারা ঈমানের (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ) পরেই কোন্ কাজ, আমলটাকে স্থান দিতেন।**

আবু ওবায়দার (রা.) মতো সাহাবার প্রশ্নের উত্তরে রসুলাল্লাহ যে জবাব দিলেন তার পরিষ্কার অর্থ এই যে ভবিষ্যতে এই উম্মাহ আবার জাগবে, আবার তার আকিদা সঠিক করে তার সঠিক অবস্থানে ফিরে যাবে। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে আখেরী যামানার যে উম্মতে মোহাম্মদীর কথা রসুলাল্লাহ বোঝাচ্ছেন তাদের ঠিক সেই সাহাবাদের মতই হতে হবে। শুধু তফাৎ থাকবে এই যে, নবীর সাহাবাদের সঙ্গে নবী ছিলেন, তার শেষ যামানার মো'মেনদের সঙ্গে তিনি থাকবেন না। অর্থাৎ আকিদায়, ঈমানে, আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য পার্থিব সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ উৎসর্গের জন্য উদগ্রীব, ইস্পাতের মতো ঐক্যে, শৃঙ্খলায়, আনুগত্যে ও হেজরতে **ঠিক সাহাবাদের মত, তফাৎ শুধু একটি এবং তা হলো আল্লাহর রসুলের মতো নেতৃত্ব ও প্রেরণা, আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব এই শেষ যামানার উম্মতে মোহাম্মদীর সঙ্গে থাকবে না।** শুধু এই তফাতের জন্যই তাদের স্থান হবে তাদেরও ঊর্ধ্বে। আল্লাহর রসুলের এইসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলি থেকে (আরও আছে) আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে ভবিষ্যতে বর্তমানের এই বিকৃত, শুধু বিকৃত নয়, একেবারে বিপরীতমুখী দীনটি আবার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যে সত্যদীন দীনুল হক, দীনুল ইসলাম পাঠিয়েছিলেন সেই দীনে ফিরে যাবে; বর্তমানের এই ফিস্ক (অবাধ্যতা), শেরক (অংশিদারিত্ব), কুফর (অবিশ্বাস), যুলম (অন্যায়), মোনাফেকী (কাপট্য) ও মালাউনী (অভিশপ্ত) ত্যাগ করে প্রকৃত মো'মেন ও মুসলিম এবং রসুলের অসম্পূর্ণ কাজকে, যে কাজের ভার, দায়িত্ব তাঁর উম্মাহর ওপর দিয়ে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন, সেই কাজ পুনরায় শুরু করে আবার উম্মতে মোহাম্মদী হবে। এনশাল্লাহ সে সময় নিকটবর্তী।

প্রকৃত ইবাদত

কলেমার প্রকৃত অর্থ- 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ (আদেশদাতা, সার্বভৌম) নেই'কে বদলিয়ে 'কোনো মা'বুদ (উপাস্য) নেই'তে পরিকর্তনের অর্থাৎ কলেমাটারই পরিকর্তনের ফল কি হয়েছে তা পেছনে বলে এসেছি। মানুষ জাতীয় জীবনে আল্লাহর সমস্ত আদেশ প্রত্যাখ্যান করে ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালকে ইলাহ এবং রব (প্রভু) বলে মেনে নিয়েছে। এদিকে ব্যক্তি জীবনে সালাহ (নামায), যাকাহ, হজ, সওম (রোযা) ও নানাবিধ কাজ করে আত্মতুষ্টিতে ডুবে আছে এই মনে করে যে তারা খুব ইবাদত করছে। দেখা যাক আল্লাহ কোন্ ইবাদত চান, প্রকৃত ইবাদত কী?

ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- **যে জিনিসটিকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজটি করাই হচ্ছে সেই সৃষ্ট জিনিসটির ইবাদত**। সূর্যকে সৃষ্টি করা হয়েছে আলো এবং তাপ দেবার জন্য, ঐ কাজই তার ইবাদত এবং সূর্য নিরবচ্ছিন্নভাবে তা করে চলেছে- ইবাদত করছে। আল্লাহ এই পৃথিবীকে অর্থাৎ মাটিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রধানত গাছপালা, ফসল, ফল, ফুল ইত্যাদি উৎপাদন করা, তা সে ত্রুটিহীনভাবে করে চলেছে, মাটি তার জন্য নির্দিষ্ট ইবাদত করে চলেছে। এমনিভাবেই পানি, আলো, বিদ্যুৎ, আগুন ইত্যাদি প্রত্যেক সৃষ্টিই সেটাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিখুঁতভাবে পালন করে চলেছে এবং যার যার জন্য নির্দিষ্ট ইবাদত করে চলেছে। এ গেলো আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসগুলি। মানুষের সৃষ্ট জিনিসের ব্যাপারেও ঐ একই নিয়ম; মানুষ যে জিনিস সৃষ্টি করেছে সেই কাজটি করাই সে জিনিসের ইবাদত। মানুষ মোটর গাড়ি (Car) সৃষ্টি করেছে, উদ্দেশ্য- ঐ সৃষ্ট জিনিসটি মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। ঐ কাজটি করাই মোটর গাড়ির (Car) ইবাদত। মানুষ বিদ্যুত উৎপাদন করছে আলো দেবার জন্য, রেডিও টেলিভিশন এবং অন্যান্য যন্ত্র চালাবার জন্য। বিদ্যুত তার কাজ করছে, এটাই তার ইবাদত এবং বিদ্যুত রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি যে সমস্ত যন্ত্র চালাচ্ছে- সেই সব যন্ত্রের যার যা কাজ তাই করাই ঐ সব যন্ত্রের ইবাদত এবং তারা তা নিখুঁতভাবে করে যাচ্ছে। আল্লাহর সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টির মধ্যে একটিই তফাৎ তা হলো মানুষ যা সৃষ্টি করে তার জন্য কাঁচামাল (Raw material) দরকার। আল্লাহর তা প্রয়োজন নেই; তাঁর ইচ্ছা এবং আদেশই যথেষ্ট। এখন দেখতে হবে **আল্লাহ মানুষকে কি জন্য, কি কাজের জন্য সৃষ্টি করলেন**। সেটা জানতে ও বুঝতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের প্রকৃত ইবাদত কী?

মানুষ সৃষ্টির বহু আগেই তিনি এই মহাবিশ্ব ও মালায়েকদের (ফেরেশতা) সৃষ্টি করেছেন। একদিন তিনি মালায়েকদের বললেন আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা স্থাপন করতে চাই (সুরা বাকারা, আয়াত- ৩০)। এবং মালায়েকদের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর খলিফা আদমকে (আ.) সৃষ্টি করলেন (আমরা মানুষ ঐ আদমের (আ.) সন্তান বনি-আদম (সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩; সুরা ইউনুস, আয়াত ১৯; সুরা নেসা, আয়াত ১))। অর্থাৎ আদম (আ.) ও **ঐ সঙ্গে আমরা মানুষ হলাম আল্লাহর খলিফা।** তাহলে খলিফা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা আমাদের সঠিকভাবে বুঝে নেয়া অতি প্রয়োজনীয়। তা না হলে আমরা আমাদের প্রকৃত ইবাদত কি তা বুঝতে পারবো না। খলিফা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- প্রতিনিধি; সার্বভৌম সরকারের শাসনিক প্রতিনিধির পদ বা কার্য; দূত; উপরওয়ালার বদলে কার্যরত ব্যক্তি; কোনো রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ শাসক, রাজপ্রতিনিধি ইত্যাদি (বিভিন্ন অভিধান)। **অর্থাৎ কেউ কোনো কাজ নিজে না করে অন্য কাউকে সেই কাজ করার জন্য নিযুক্ত করলে সেই লোক হলো তার খলিফা।** অনেক বেশি সংখ্যায় মুরিদ হওয়ায়, বা অন্য যে কোনো কারণে কোনো পীর, শায়খ মুরিদদের মধ্য থেকে বেছে বেছে তার খলিফা নিযুক্ত করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ঐ খলিফারা শায়খ যে পদ্ধতিতে অর্থাৎ তরিকায় তার মুরিদদের শিক্ষা দেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে মুরিদদের শিক্ষা দেবেন তা থেকে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করতে পারবেন না। অর্থাৎ পীরের পক্ষ হয়ে, তার হয়ে কাজ করা অর্থাৎ পীরেরই কাজ অন্য একজন করছেন, কারণ তাকে পীরের খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে। যদি মুরিদ শায়খের খেলাফত পেয়ে শায়খের পদ্ধতি, তরিকা কেটে-ছেটে বা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে নিজে তরিকা তৈরি করে সেই মোতাবেক মুরিদদের তালিম তরবিয়ত দিতে থাকেন, কিন্তু মুখে শায়খের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন তবে শায়খ বা পীর কি তাকে তার খলিফা হিসাবে সহ্য করবেন?

অন্য একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একজন সার্বভৌম বাদশাহ বা রাজা তার বিশাল রাজত্বের একটি প্রদেশের জন্য একজন শাসক (Governor) নিযুক্ত করলেন। ঐ শাসক হলেন বাদশাহর নিযুক্ত রাজ প্রতিনিধি অর্থাৎ বাদশাহর খলিফা। বাদশাহর তৈরি আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি, সমাজবিধি ইত্যাদি যা দিয়ে বাদশাহ নিজে শাসন কাজ পরিচালনা করেন, তার নিযুক্ত ঐ রাজ প্রতিনিধি অর্থাৎ খলিফারও কাজ হবে তাই; অর্থাৎ বাদশাহর যা কাজ ঐ খলিফারও সেই কাজ। ঐ প্রতিনিধির কোনো অধিকার নেই বাদশাহের দেওয়া কোনো আইন, কোনো দ-বিধি, অর্থনীতিতে কোনো পরিবর্তন করার। ঐ প্রতিনিধি যদি মুখে বাদশাহর সার্বভৌমত্বকে সদা-সর্বদা স্বীকার করেও বাদশাহর দেওয়া আইন-কানুন, দ-বিধি, অর্থনীতি ইত্যাদির কোনোটা বাদ দিয়ে তার নিজের হুকুম চালান তবে বাদশাহ কি তাকে তার পদে রাখবেন? তাকে তার প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি বহাল রাখবেন? নাকি তাকে রাজধানীতে

ডেকে নিয়ে তাকে শুধু পদচ্যুতই করবেন না, তাকে কঠোর শাস্তিও দেবেন। ঐ প্রতিনিধি, গভর্নর, খলিফা যদি প্রকাশ্যে বাদশাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে দিনে পাঁচবার বাদশাহকে সাজদাও করে কিন্তু বাদশাহর দেওয়া শাসনব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নিজের তৈরি শাসনব্যবস্থা, আইন-কানুন, দ-বিধি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তৈরি করে সেগুলি দিয়ে বাদশাহর প্রদেশ শাসন করে তবে বাদশাহ তার মৌখিক ঘোষণা ও পাঁচবার সাজদাকে কোনোই দাম দেবেন না, তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে **খেলাফত হচ্ছে কেউ তার নিজের কর্তব্য কাজগুলি যদি নিজে না করে সেগুলি করার জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করে তবে তাকে খেলাফত অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হলো** এবং সেই নিযুক্ত লোকটি হলো খলিফা। আল্লাহ আদম (আ.) অর্থাৎ বনি-আদম, মানুষজাতিকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করলেন, এবং করলেন তাঁর মহাসৃষ্টির, মহাবিশ্বের মধ্য থেকে শুধু এই পৃথিবীতে। বললেন- 'ফিল আরদে' অর্থাৎ পৃথিবীতে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও নয় (সুরা বাকারাহ, আয়াত ৩০)। তাহলে খলিফা হিসাবে পৃথিবীতে মানবজাতির কাজ কি? কর্তব্য কি?

বনি-আদমকে, মানুষকে তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি নিযুক্ত না করলে আল্লাহর যে কাজ ছিল সেইটাই হলো মানুষের কাজ, কর্তব্য। কী সেই কাজ? আল্লাহর কি কাজ? আল্লাহর কাজ হলো শাসন। **নিজের সৃষ্ট এই মহাবিশ্বকে শাসনই তাঁর কাজ। পৃথিবীতে এই কাজটা তিনি নিজে না করে দায়িত্ব দিলেন মানুষকে;** অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর হয়ে, তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীতে শাসন করবে। কেমন করে করবে? আল্লাহ যেমন নিজের তৈরি আইন-কানুন, নিয়মনীতি মোতাবেক মহাবিশ্ব শাসন করছেন, তেমনি পৃথিবীর শাসনের জন্য তিনি নিজে শাসন করলে যে আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি দিয়ে শাসন করতেন সেই আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি তাঁর খলিফাকে দিয়ে বললেন- এইগুলি অনুযায়ী তোমরা তোমাদের শাসনকার্য পরিচালনা করবে। এটাই হলো তোমাদের ইবাদত যে জন্য তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি।

এই মহাবিশ্ব (Universe) সৃষ্টি করে তাঁর স্রষ্টা আল্লাহ সেটাকে তাঁর নিজের সৃষ্ট আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি মোতাবেক পরিচালনা করছেন। এই মহাসৃষ্টির মধ্যে কেউ নেই, কোনো জিনিস নেই যার বিন্দুমাত্র, এমনকি অণুমাত্র স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। যাকে যে কাজ বেঁধে দিয়েছেন সে কাজ সে নিখুঁতভাবে করে চলেছে; তা থেকে পরমাণু পরিমাণও বিচ্যুতির শক্তি নেই। এই প্রথম তিনি একটি জীব সৃষ্টি করলেন যার মধ্যে তিনি তাঁর আইন-কানুন, নিয়ম-নীতিকে ভঙ্গ কোরবার ইচ্ছাশক্তি দিলেন। কেমন করে দিলেন? আদমকে (আ.) সৃষ্টি করে তিনি তাঁর মধ্যে নিজের রূহ, আত্মা থেকে ফুঁকে দিলেন (সুরা হেজর, আয়াত ২৯; সুরা সাজদা, আয়াত ৯; সুরা সা'দ, আয়াত ৭২)। নিজের আত্মা থেকে ফুঁকে দেওয়ার অর্থ আল্লাহর যত গুণ (সিফত) আছে সবগুলিই আদমের

মধ্যে চলে এলো। আল্লাহর গুণগুলির (সিফত) মধ্যে একটি হলো কাদেরিয়াহ, নিজের ইচ্ছামত কাজ করার শক্তি, যেটা সৃষ্টির আর কারো নেই; যে জন্য মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত। আল্লাহর গুণগুলি (সিফত) প্রত্যেকটিই অসীম, যেমন তিনি নিজে অসীম; কিন্তু আদমের (আ.) অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যেটুকু তিনি ফুঁকে দিলেন সেটুকু হলো অতি সামান্য। মহাসমুদ্র থেকে একটি ফোটার মত, এমনকি তাও নয়। আল্লাহ আদমকে (আ.) তাঁর নিজের গুণাবলি ও শক্তি দিলেন কেন? কারণ হলো- কেউ কাউকে তার নিজের কাজ করার জন্য খলিফা, প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে তাকে তার পক্ষ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা অবশ্যই দিতে হবে নইলে সে কি করে কাজ করবে? পার্থিব কাজেও কেউ নিজের কাজের দায়িত্ব অন্যকে অর্পণ করলে তাকে ওকালতনামা বা Power of Attorney দিতে হয়। নিজের আত্মা থেকে আদমের (আ.) মধ্যে ফুঁকে দেওয়াকেই তিনি বললেন- আমি আদমকে আমার আমানত দিলাম (সুরা আহযাব, আয়াত ৭২)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ একমাত্র আদেশদাতা, ইলাহ এবং একমাত্র উপাস্য, মা'বুদ। **প্রথমে তাঁকে একমাত্র ইলাহ, আদেশদাতা সার্বভৌম বলে স্বীকৃতি দিতে হবে, তারপর তাঁর আদেশ মেনে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হবে** অর্থাৎ তিনি নিজে যে কাজ করতেন অর্থাৎ শাসন তা তারই দেয়া আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক করতে হবে, এটাই হলো তাঁর ইবাদত। কলেমার ইলাহ শব্দকে মা'বুদে, উপাস্যে পরিণত করার ফল এই হয়েছে যে আজ মুসলিম বলে পরিচিত কিন্তু কার্যত কাফের, মোশরেক, যালেম, ফাসেক ও মোনাফেক এই জনসংখ্যা ইলাহতেও নেই, মা'বুদেও নেই, কারণ এটা আল্লাহর উলুহিয়াহ্ এবং রবুবিয়াহ ত্যাগ করে দাজ্জালের উলুহিয়াহ্ এবং রবুবিয়াহ গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করে দাজ্জালের পায়ে সিজদায় প্রণত হয়েছে, তার ইবাদত করছে। এই জনসংখ্যা ইবাদত মনে করে কি কাজ করছে তা দেখা যাক।

আল্লাহ মানুষকে অর্থাৎ আদম (আ.) ও বনি-আদমকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তাঁর হয়ে তাঁরই দেয়া আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি অনুযায়ী নিজেদের শাসন কাজ পরিচালনা করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, যারা আমার নাযেল করা বিধান (কোর'আন) দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা (হুকুম) করে না, তারা কাফের, জালেম এবং ফাসেক (সুরা মায়েদা, আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই বিভ্রান্ত(দোয়াল্লিন) জনসংখ্যা সালাহ (নামায), যাকাহ, হজ ও সওম (রোযা) পালন করে মনে করছে আমরা খুব ইবাদত করছি। **আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীতে তাঁর কাজ যদি খেলাফত অর্থাৎ ইবাদত হয়ে থাকে** তবে প্রশ্ন এই যে- আল্লাহ কি সালাহ (নামায) কায়েম করেন? তিনি কি যাকাহ দেন? তিনি কি হজ করেন? তিনি কি সওম (রোযা) রাখেন বা রাত্রে

ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন বা অন্যান্য যে সব কাজ করে এরা মনে করেন যে খুব ইবাদত করছি, তার একটাও করেন? অবশ্যই নয়। এগুলো খেলাফতের অর্থাৎ প্রকৃত এবাদতের কাজ নয়। তাহলে এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর দেয়া দীনে (জীবন-ব্যবস্থায়) মানুষের জীবনের সর্বপ্রকার অঙ্গনের, ভাগের (Facet) সমাধান ও ব্যবস্থা দেওয়া আছে; তা না হলে তা সর্বাঙ্গীন ও নিখুঁত হয় না। আল্লাহর দেয়া দীন (জীবন-ব্যবস্থা) পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। তিনি বলেছেন- তোমাদের জন্য দীন আমি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ করে দিয়েছি (সুরা মায়েদা, আয়াত ৩)। শুধু তাই নয় তিনি বলেছেন- এতে আমি কিছুই বাদ দেই নি (সুরা ফোরকান, আয়াত ৩৩)। কাজেই মানুষের জীবনের বিভিন্ন ভাগের (Facet) জন্য তাঁর বিধান দেয়া আছে। তাঁর দীনকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল রাখার জন্য ও কখনও এটার ওপর কোনো আক্রমণ আসলে তাকে প্রতিহত করার জন্য যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্যপূর্ণ ও অন্যায়বিরোধী চরিত্রের মানুষের প্রয়োজন সেই চরিত্রের মানুষ সৃষ্টির জন্য সালাতের (নামাযের) ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষের জীবনে অর্থ ও সম্পদ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়; সেটার সুব্যবস্থা, যাতে সেখানে অর্থ ও সম্পদের অসম বণ্টন না হয়, অবিচার না হয় সেজন্য সমস্ত সম্পদের দ্রুত সঞ্চরণভিত্তিক যাকাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে দীনের কোথায় কি অবস্থা, কি সমস্যা, কোথায় কি করা প্রয়োজন এবং হাশরের দিনে আল্লাহর কাছে জীবনের কাজের হিসাব দেবার মহড়ার (Rehearsal) জন্য বাৎসরিক হজ্বের ব্যবস্থা রেখেছেন। তারপর যেহেতু মানুষ দেহ ও আত্মার সম্মিলিত একটি একক (টহরঃ) তাই তার আত্মার পরিচ্ছন্নতা উন্নতির জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন সাওমের (রোযার)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে **দীনের পাঁচটি রোকনের (স্তম্ভের) চারটিই সমষ্টিগত, মাত্র একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত এবং সেটি সওম (রোযা)।**

ইবাদত মনে করে আজ এই গোমরাহ (বিভ্রান্ত) জনসংখ্যা যা করছে তা প্রকৃত ইবাদত অর্থাৎ খেলাফতের কাজ নয়; খেলাফতের কাজ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া দীনকে (জীবন-ব্যবস্থা) প্রয়োগ ও কার্যকরী (Effective) ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন সেগুলি। **প্রকৃত ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর দেয়া দীন (জীবন-ব্যবস্থা) মোতাবেক তাঁর পক্ষ হয়ে শাসন করা।** সেই ইবাদত থেকে এই জনসংখ্যা আজ শুধু লক্ষ কোটি মাইল দুরে নয়, একেবারে বিপরীতমুখী। দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে এটা আল্লাহর ফাসেক (অবাধ্য) হয়েছে এবং দাজ্জালের, মানুষের তৈরি জীবন-ব্যবস্থা জীবনে প্রয়োগ করে আল্লাহর উপাসকের বদলে দাজ্জালের উপাসকে পরিণত হয়েছে। আজ মুসলিম নামধারী নামাযী, যাকাহ দানকারী, হজ ও রোযা পালনকারী এই জনসংখ্যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার ইলাহতেও নেই, সেটার ভুল অর্থ করে যে মা'বুদে গেছে সে এবাদতেও নেই। আল্লাহ এই জনসংখ্যার ইলাহও

নন, মা'বুদও নন (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি পড়ুন)।

আমি জানিনা যে আল্লাহ যে ইবাদত করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করলেন সেই প্রকৃত ইবাদত আমি বুঝিয়ে বলতে পারলাম কিনা। যে ইবাদতের কথা তিনি বলেছেন, "আমি জ্বীন ও মানুষ জাতিকে আমার ইবাদত করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নি (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি পড়ুন)।" এই ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর খেলাফত অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব করা। এটা করতে গেলেই **তাঁর পূর্বশর্ত তাঁর দীনুল হক অর্থাৎ তাঁর দীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা**। এটা আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। অর্থাৎ কোথাও তাঁর প্রকৃত ইবাদত অর্থাৎ খেলাফত নেই, এমন কি আমরা হেযবুত তওহীদ, যারা দীনুল হকে আছি, আমরাও প্রকৃত ইবাদত করতে সমর্থ নই।

এক অনন্য সুযোগ

আল্লাহর রসুল বলেছেন- **অভিশপ্ত দাজ্জালকে যারা প্রতিরোধ করবে তাদের মরতবা (সম্মান, দরজা ও পুরস্কার) বদর ও ওহোদ যুদ্ধে শহীদের মরতবার সমান হবে।** [হাদিস- আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম]

দাজ্জালের গোটা ব্যাপারটাই মহা গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট। মানবজাতির আয়ুষ্কালের মধ্যে সর্ববৃহৎ ঘটনা এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই, কারণ এটা বলেছেন স্বয়ং আল্লাহর রসুল। কিন্তু উপরের এই হাদিসটি আমাদের, অর্থাৎ বর্তমান কালের মানুষের জন্য একটি বিশেষ বার্তা, সংবাদ এনে দিচ্ছে। হাদিসটি একটু খেয়াল করে পড়লে এর কয়েকটি বিশেষত্ব চোখে পড়বে। ইসলামে আল্লাহ তাঁর মো'মেন বান্দাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার রেখেছেন শহীদদের জন্য এবং তা হচ্ছে পার্থিব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, বিনা বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতে স্থান দেওয়া। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানও রেখেছেন সেই শহীদদের জন্যই এবং তা হচ্ছে তারা মরলেও তাদের মৃত না বলা। শুধু তাই নয়- আল্লাহ শহীদদের জন্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (Specialties) দান করেছেন যা অন্য মো'মেন, মুসলিম তো বটেই এমন কি তাঁর নবী-রসুলদেরও দেন নাই; যেমন শহীদের গোসল দেয়া, জানাজা পড়া, কাফন দেয়া ইত্যাদির দরকার নেই, তারা কবরে মালায়েকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না ইত্যাদি। এই সম্মান, এই পুরস্কার ও এই বৈশিষ্ট্যগুলি সব শহীদদের জন্য।

দাজ্জালকে প্রতিরোধকারীদের সম্বন্ধে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে,

(১) তারা শহীদ না হয়েও শুধু প্রতিরোধ ও যুদ্ধ করেই শাহাদাতের সম্মান, পুরস্কার ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন।

(২) দাজ্জালকে প্রতিরোধকারী অর্থাৎ যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আল্লাহ তাদের দুইজন শহীদের পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য দান করবেন। এছাড়া ইসলামের আর কোথাও কাউকে দুইজন শহীদের পুরস্কার বা সম্মান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নাই। শুধুমাত্র উম্মে হারাম (রা.) বর্ণিত একটি মাত্র হাদিসে পাওয়া যায় যে সামুদ্রিক যুদ্ধে ডুবে মারা গেলে সে মোজাহেদকে দু'জন শহীদের সমান সওয়াব দেয়া হবে। এ হাদিসটির উৎস সুনানে আবু দাউদ এবং এটি সহিহ হাদিস নয়, হাসান; তাও ঐ দুই শাহাদাত সাধারণ শাহাদাত।

(৩) দাজ্জালকে প্রতিরোধকারীদের আল্লাহ শুধু যে দুইজন সাধারণ শহীদের পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য দান করবেন তা নয়, ঐ দুই শহীদ আবার একটি বদরের যুদ্ধের শহীদের এবং আরেকটি ওহোদের যুদ্ধের শহীদের।

(৪) সমস্ত শহীদদের মধ্যে বদর ও ওহোদ যুদ্ধের শহীদদের মরতবা সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ বদর ও উহুদের যে কোনো যুদ্ধে আল্লাহর রসুল (দ.) পরাজিত হলে তওহীদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতো না। আল্লাহর রসুল বদরের যোদ্ধাদের সম্বোধন করে বলেছেন- **তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, তোমাদের জন্য জান্নাত নিশ্চিত হয়ে গেছে** (হাদিস- আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বুখারী)। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে বিশ্বনবী এই আশ্বাস দিচ্ছেন বদরের যোদ্ধাদের, শহীদদের নয়, যারা শুধু যুদ্ধ করেছেন, শহীদ হন নাই তাদের। আর দাজ্জালের প্রতিরোধকারীদের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে শুধু ঐ বদরের যোদ্ধাদের নয়, শহীদের; এবং শুধু বদরের নয়, বদরের এবং ওহোদের যুদ্ধের শহীদদের সম্মিলিত পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্যের।

দাজ্জালকে প্রতিরোধকারীদের জন্য আল্লাহ এমন অকল্পনীয় সম্মান, পুরস্কার ও আসন (মাকাম) কেন রেখেছেন? তার কারণ এখানে প্রশ্ন ইবলিসের দেয়া আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ, আল্লাহর জয় পরাজয়ের প্রশ্ন। আজ দাজ্জাল আল্লাহর তওহীদকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে রব বলে দাবি করে, আল্লাহর হাত থেকে তাঁর সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়ে মানবজাতির ওপর মানুষের সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। মানবজাতির অতি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন একটি অংশ ছাড়া আজ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলার মতো পৃথিবীতে আর কেউই নেই। **দাজ্জাল তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে সেই ক্ষুদ্র দলটিকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।** কাজেই দাজ্জালের বিরোধিতা করা, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জেহাদ করার পুরস্কার বদর ও ওহোদের শহীদদের পুরস্কারের, সম্মানের সমান।

(৫) পরকালে শহীদরা সমস্ত মো'মেন ও মুসলিমদের ঈর্ষার পাত্র হবেন এবং দেখা যাচ্ছে দাজ্জালকে প্রতিরোধকারীরা সমস্ত শহীদদের ঈর্ষার পাত্র হবেন। এমন কি বদরের এবং ওহোদের শহীদদেরও। কারণ তারা প্রত্যেকে একজন শহীদের সম্মান, পুরস্কার ও বৈশিষ্ট্য পাবেন। বদরের শহীদ বদরের যুদ্ধের শাহাদাতের এবং ওহোদের শহীদ ওহোদের যুদ্ধের শাহাদাতের পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য পাবেন। বদরের শহীদ ওহোদের এবং ওহোদের শহীদ বদরের শাহাদাতের পুরস্কার ও সম্মান পাবেন না। কিন্তু দাজ্জালের প্রতিরোধকারীদের আল্লাহ বদরের এবং ওহোদের যুদ্ধের শহীদদের সম্মিলিত পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য দান করবেন।

সমস্ত ইসলামে আমি কোথাও কোনো কাজের, কোনো সৎকার্যের জন্য এতবড়, এত অকল্পনীয় বিরাট পুরস্কার ও সম্মান দেখি না। এ পুরস্কার ও সম্মান সমস্ত শহীদদের জন্য পুরস্কার ও সম্মানকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এই **অকল্পনীয় সম্মান ও পুরস্কারের সুযোগ কোনো নবী রসুল পান নি, কোনো উম্মাহও পান নি** কারণ তাদের সময় দাজ্জাল আবির্ভূত হয় নি। দাজ্জাল আবির্ভূত হয়েছে আমাদের সময়

এবং ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে এসে তাকে হত্যা অর্থাৎ ধ্বংস করার পর আর কোনোদিন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না। যেহেতু ৪৮১ বছর আগে দাজ্জালের জন্ম হয়েছে এবং বর্তমানে সে পূর্ণবয়স্ক সেহেতু সন্দেহের বিশেষ কোনো অবকাশ নেই যে ঈসার (আ.) আগমনের সময়ও নিকটবর্তী। তিনি দাজ্জাল ধ্বংস করলেই **আর কোনোদিন দাজ্জালের প্রতিরোধ করে ঐ অকল্পনীয় সম্মান ও পুরস্কারের সুযোগ থাকবে না।**

মানুষের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে এই যে সামান্য সময়টুকু আমরা পাচ্ছি, এই সময়ের মধ্যে যারা দাজ্জালকে প্রতিরোধ করবেন, তার বিরুদ্ধে জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) করবেন শুধু তারাই ঐ অকল্পনীয় পুরস্কার ও সম্মান পাবেন আল্লাহর কাছ থেকে।

পেছনে বলে এসেছি যে দাজ্জালকে প্রতিরোধকারীদের জন্য আল্লাহ যে সম্মান ও পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন তা সমস্ত ইসলামে আর কারও জন্য রাখেন নি; এমন কি অন্যান্য শহীদদের এবং নবী-রসুলদের জন্যও নয়। কোনো শহীদদের বা নবী-রসুলদের দুই দুইটি শাহাদাতের সম্মান ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি; তাও বদরের ও ওহোদের যুদ্ধের শহীদদের সমান এবং শহীদ না হয়েও ঐ সম্মান ও পুরস্কার। এর কারণ কি?

এর কারণ হচ্ছে এই যে **দাজ্জাল আল্লাহকে তাঁর সার্বভৌমত্বেও (উলুহিয়াতের) আসন থেকে চ্যুত করে নিজে সে আসনে বসতে চায়।** দাজ্জালের দাবি এই যে মানবজাতি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে তার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা তাদের সামষ্টিক জীবনে, অর্থাৎ মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সে কেমন করে চলবে সে ব্যাপারে দাজ্জালের কোনো দাবি নেই; মানুষ মসজিদে, মন্দিরে, চার্চে, সিনাগগে, প্যাগোডায় যাক না যাক, আল্লাহকে, ঈশ্বর ও দেব-দেবীকে, গডকে, এলিকে বা বুদ্ধকে উপাসনা করুক আর নাই করুক তার কোনো দাবি নেই। কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে অর্থাৎ রাজনীতিতে, প্রশাসনে, অর্থনীতিতে, আইন-কানুন, দ-বিধিতে, শিক্ষানীতিতে স্রষ্টার দেওয়া বিধান ও মূল্যায়নকে পরিত্যাগ করে **দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার বিধান ও মূল্যায়নকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে তার দাবি।**

দাজ্জালের এই দাবি সমস্ত মানবজাতি মেনে নিয়েছে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১৩ ও ১৪ নং হাদিস), এমন কি মুসলিম হবার দাবিদার জাতিটিও মেনে নিয়েছে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১২ নং হাদিস) । আজ সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও স্রষ্টার, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই, মানবজাতির সমষ্টিগত জীবনে আজ মানুষেরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর এটাই হচ্ছে দাজ্জালের দাবি। রাজতন্ত্র (Monarchy), সমাজতন্ত্র (Socialism), গণতন্ত্র (Democracy), সাম্যবাদ (Communism), একনায়কতন্ত্র (Fascism) এগুলো সবই দাজ্জালের

বিভিন্ন রূপ। এর মধ্যে বর্তমানে গণতন্ত্র অন্য সব রূপকে ছাপিয়ে, অবদমিত করে আধিপত্যের স্থান দখল করেছে এবং এটাকেই জুডিও খ্রিষ্টান সভ্যতা নিজেও গ্রহণ করেছে এবং এটাকে বাকি মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করছে। গত বিশ্বযুদ্ধে যদি হিটলারের একনায়কতন্ত্র (Fascism) জয়ী হতো, তবে বাকি পৃথিবী আজ ফ্যাসিজম, একনায়কতন্ত্রের অধীনে থাকতো; এবং গণতন্ত্র ও সাম্যবাদকে অপাংক্তেয় করে রাখতো, যেমন আজ একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদকে করে রাখা হয়েছে। হিটলারের জার্মানির অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রের পরাজয়ের পর দাজ্জালের অন্য বিভাগ, গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ পৃথিবীর আধিপত্যের জন্য বহুদিন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধের (Cold War) পর সাম্যবাদ (Communism) পরাজিত হয়ে গেলো এবং ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে গেলো। এই দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধ সার্বিকভাবে যুদ্ধে (Shooting War) পর্যবসিত হয় নাই শুধু একটিমাত্র কারণে, আর সেটা হলো- এই উভয় পক্ষের হাতেই ছিল পারমাণবিক অস্ত্র; উভয় পক্ষই জানত যে এক পক্ষ এটা ব্যবহার করে অপরকে ধ্বংস করতে পারলেও তার নিজেরও ধ্বংস অনিবার্য। যাহোক **একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদের এই পরাজয়ের পর থেকে ধনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক শক্তিই আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সার্বভৌমত্বেও অধিকারী এবং এই শক্তিই আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে পরাজিত করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।**

গণতন্ত্রই মানুষের জীবন-ব্যবস্থার (দীন) সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্র, প্রণালি, এবং এর কোনো বিকল্প নেই- এ কথা পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে, বক্তৃতায়, আলোচনায় এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় অবিশ্রান্ত, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচারের ফলে **আজ প্রায় সমস্ত মানবজাতি এই মিথ্যাকে, এই কুফরকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে।**

এই মিথ্যাকে গ্রহণ করতে কোনো জাতি রাজি না হলে বা গড়িমসি করলে দাজ্জাল তাদের সঙ্গে অন্য জাতিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে (Economic Sanction) আর্থিকভাবে তাদের ক্ষতি করে তাদের বাধ্য করে। তাতে যদি কাজ না হয় তবে তাদের অবরুদ্ধ করে অর্থাৎ অবরোধ আরোপ (Embargo) করে তাদের নতজানু হতে বাধ্য করে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ৮ নং হাদিস)। তাতেও যদি ঐ জাতি আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ না করে অর্থাৎ গণতন্ত্র মেনে না নেয় তবে তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তাদের পরাজিত করে মানুষের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই করতে যেয়ে তারা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বেসামরিক লোক, নারী, শিশু, বৃদ্ধদের বোমা মেরে হত্যা করে, শত শত নগর, গ্রাম গুড়িয়ে দেয় এবং এ কাজকে তারা কোনো অন্যায় মনে করে না। এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞকে তারা বলে Collateral damage, আনুষাঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি, এটা কিছু না, যুদ্ধে এটা হয়েই থাকে।

এই পৃথিবী যার হাতের মুঠোয়, যাকে পরাজিত করার শক্তি কারো নেই সেই মহাশক্তির বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বিজয়ী করার জন্য তাদের প্রাণ ও

পার্থিব সম্পদ নিশ্চিতভাবে কোরবানি করার জন্য দাঁড়াবে তাদের জন্য আল্লাহ যে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান তাঁর কাছে মজুত রাখবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? এ সম্মান ও পুরস্কার নবী-রসুলদের জন্যও আল্লাহ রাখেন নি কারণ কোনো নবী-রসুলকে **এমন মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয় নি যেটার শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন করবে** (পরিচিতি অধ্যায়ের ১৩ নং হাদিস)।

কিন্তু এই দানবরূপী দাজ্জালও আল্লাহর নবী ঈসার (আ.) হাতে ধ্বংস হবে এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আবার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে- এ সুসংবাদ আল্লাহর শেষ রসুল আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন (হাদিস- আব্দুলাহ বিন ওমর (রা.) থেকে- মুসলিম এবং নাওয়াস বিন সা'মান (রা.) থেকে- মুসলিম ও তিরমিযি এবং মেকদাদ (রা.) থেকে আহমেদ, মেশকাত)। এই যুগে জন্মে মানুষ জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনায় অংশ নিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছ থেকে এই অকল্পনীয় পুরস্কার ও সম্মান যারা লাভ করবে না তারা প্রকৃতই হতভাগ্য।

আল্লাহর রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রসুল বর্ণিত দাজ্জালকে প্রতিরোধকারী সেই দুই শাহাদাত লাভকারীরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে কি হয় নি? প্রথমত: আমি এই বইয়ে নিশ্চিতভাবে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, বর্তমান ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হচ্ছে রসুলাল্লাহ কর্তৃক রূপকভাবে বর্ণিত সেই দাজ্জাল। এবং **একদল লোক এই সত্যটি উপলব্ধি করে দাজ্জালের প্রকৃত রূপ মানুষের সামনে প্রচার করছেন।** দাজ্জালের প্রকৃত রূপ মানুষকে চিনিয়ে দেওয়াই দাজ্জালের প্রকৃত প্রতিরোধ। চাকচিক্যময় এ প্রতারক সভ্যতার আসল রূপ মানুষের কাছে তুলে ধরলেই মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তারা নিরলসভাবে এই কাজই করে চলেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে মুসলিম বলে বিশ্বাসী জনসংখ্যাটিও বর্তমান ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাকে প্রভু বলে স্বীকার করে তার অনুসরণ করছে, কারণ তারা একে দাজ্জাল বলে চিনতে পারছে না। বর্তমান ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাকে দাজ্জাল বলে চিনতে পারলে অর্থাৎ দাজ্জাল যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে এ কথা বুঝতে পারলে তারা কখনোই দাজ্জালকে তাদের প্রভু বলে স্বীকার করতো না, তার অনুগত হয়ে যেত না এবং অনুসরণ করতো না। সুতরাং দাজ্জালকে মানুষের কাছে চিনিয়ে দেওয়াই হচ্ছে দাজ্জাল প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এই কাজটিই এই লোকগুলি আপ্রাণ চেষ্টায় করে যাচ্ছেন। এই দলটিরই নাম হেযবুত তওহীদ। যেহেতু দাজ্জালকে চিহ্নিত করার পর সমস্ত পৃথিবীতে শুধু এই দলটিই দাজ্জালকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে, সেহেতু এরাই রসুল বর্ণিত জীবিত অবস্থায় দুই শাহাদাতের মর্তবা লাভকারী সেই দল। বিষয়টিকে ভালো করে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন, যদি আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, আখেরী যামানায় আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক আবির্ভূত হবে, যাদের মাথায় তিনটি করে শিং থাকবে। তারা হবে জান্নাতী। এখন যদি সত্যই একদল লোক আবির্ভূত হয়, যাদের মাথায় তিনটি করে শিং আছে তাহলে কি সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে যে কোনোটি সেই জান্নাতী দল? তেমনিভাবে আজ যখন মুসলিম জনসংখ্যাসহ সমস্ত মানবজাতি জাতীয় জীবনে আল্লাহকে বাদ দিয়ে দাজ্জালের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে অর্থাৎ দাজ্জালের

রচিত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন এই একমাত্র দলটিই দাজ্জালকে চিহ্নিত করে তাকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। সুতরাং ঐ তিন শিংওয়ালা দলটির মতই এই দলটি বদর ও ওহোদের শাহাদাতের পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী, নয় কি?

এ তো গেল যুক্তির কথা। যদিও যে কোনো বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য এ যুক্তিই যথেষ্ট; তারপরও যদি প্রমাণ প্রয়োজন হয় তবে সেই প্রমাণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর কোর'আনে শহীদদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা এই দলের লোকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, কারণ তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না" (সুরা বাকারাঃ ১৫৪)। তিনি বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে যে, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না, কারণ তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে রেযেকপ্রাপ্ত" (সুরা ইমরানঃ ১৬৯)। এখানে আমরা আল্লাহর কথা থেকে পাচ্ছি, ১) শহীদরা মৃত নয়, তারা জীবিত, আমাদের মতই তারা জীবিত। কারণ আল্লাহ বলোছেন, তারা রেযেকপ্রাপ্ত, রেযেক শুধু জীবিতদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মৃতদের জন্য নয়, মৃতদের রেযেকের কোনো প্রয়োজন নেই। ২) আল্লাহ তাঁদের মৃত বলোতে নিষেধ করেছেন। এটা আল্লাহর আদেশ, সুতরাং তাঁদের মৃত বলা হারাম। ৩) শুধু এই নয়, শহীদদের মুখে মৃত না বলে শুধু মনে মনে তাদের মৃত মনে করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন অর্থাৎ হারাম করেছেন। পার্থিব মৃত্যুর পর শহীদদের হৃদযন্ত্র ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার জীবন তার দেহের মধ্যেই রয়ে যায়, তাদেরকে জীবন্তই অবস্থাতেই দাফন করা হয়। তাদের হৃদযন্ত্র ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকার কারণে আমরা এটা বুঝতে পারি না। এই অবস্থা সম্বন্ধেই আল্লাহ বলেছেন, "...তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।"

অনেকের ধারণা শহীদদের মৃত না বলার জন্য আল্লাহর এ হুকুম তাদের সম্মানের জন্য, প্রকৃত অর্থে তারা মৃতই। বিনা বিচারে জান্নাত তাদের পুরস্কার এবং মৃত না বলার হুকুম তাদের সম্মান। ধারণাটি সত্য নয়। আল্লাহ সরাসরি বলোছেন, শহীদরা জীবিত। **সত্যিকারভাবে তারা মৃত হলে এবং মৃত না বলার আদেশ কেবলই সম্মানসূচক হলে "তারা জীবিত" আল্লাহর এই ঘোষণা মিথ্যা হয়ে যায়, যা কখনোই সম্ভব নয়।** সুতরাং তাদের মৃত না বলার হুকুম সম্মানসূচক নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে জীবিত থাকেন বলেই আল্লাহ মৃত বলতে নিষেধ করেছেন এবং তদেরকে জীবিত বলেছেন।

এখন বিরাট প্রশ্ন হলো, দাজ্জাল প্রতিরোধকারীগণ রসুলাল্লাহর কথা অনুযায়ী দুই শহীদ এবং আল্লাহর কথা মোতাবেক পরলোকগমনের পরও তারা জীবিত

থাকবেন। হেযবুত তওহীদের দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের এ জাতীয় কোনো প্রত্যক্ষ শাহাদাতের প্রমাণ আছে কি না?

হ্যাঁ। সেই প্রমাণও আল্লাহ দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, হেযবুত তওহীদের যারা পরলোকগমন করছেন শাহাদাতের চিহ্নস্বরূপ তাদের দেহ সকল স্বাভাবিক মৃতদেহের মতো শক্ত হচ্ছে না অর্থাৎ তাদের রাইগর মর্টিস (Rigor Mortise) হচ্ছে না। চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Science) মতে মানুষ মারা গেলে দুই-আড়াই ঘণ্টা পর থেকেই শক্ত হতে আরম্ভ করে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহ এক খ- কাঠের মতো শক্ত হয়ে যায় এবং তাপমাত্রা বরফের মতো ঠা-া হয়ে যায়। এরপর আরও ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত দেহ এভাবে শক্ত অবস্থায় থাকে। এর পর থেকে দেহ আবার নরম হয়ে পঁচতে গলতে আরম্ভ করে। Forensic Science মোতাবেক যে কোনো প্রাণী মারা গেছে কি যায় নি তার নিশ্চিত প্রমাণ হলো এই রাইগর মর্টিস, এই শক্ত হয়ে যাওয়া। রাইগর মর্টিস না হলে বুঝতে হবে প্রাণীটি জীবিত আছে, রাইগর মর্টিস হয়ে গেলে বুঝতে হবে এটি মারা গেছে। পুরো জীবজগতে এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

বেশ কিছুদিন যাবত আমরা লক্ষ্য করছি, হেযবুত তওহীদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে এই চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মটি কার্যকরী থাকছে না। তাদের কারোর ইন্তেকাল করার পর তার দেহ শক্ত হচ্ছে না, এমন কি তাপমাত্রাও স্বাভাবিক মৃতের ন্যায় শীতল হয়ে যাচ্ছে না। ইন্তেকালের ২৭ ঘণ্টা পরও একজনের দেহে মৃত্যু পরবর্তীকালীন এই স্বাভাবিক লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয় নি। এমন কি একজনকে কবর দেওয়ার ৫ মাস পরে ঘটনাক্রমে কবর উন্মোচিত হয়ে যায়। লোকজন দেখতে আসে। দেখা গেল তার দেহ একটুও পঁচে নাই, গলে নাই, একদম অবিকৃত আছে। এমন কি তার কিছু পরিচিত লোকের অভিমত হলো, তার চেহারা জীবিত অবস্থার চেয়ে তখন আরো সুন্দর দেখা গেছে। হেযবুত তওহীদের এই অনুসরীগণের কেউ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন নয়, স্বাভাবিকভাবে রোগে ভুগে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ইন্তেকাল করলেও তাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাই ঘটছে। এমন ঘটনা একটি দু'টি নয়, অনেকগুলি হয়েছে। ঘটনা ও সাক্ষীদের স্বাক্ষরসহ বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে আছে। কেউ দেখতে চাইলে দেখানো যাবে ইনশা'আল্লাহ। ইন্তেকালের পর দেহ শক্ত না হওয়ার কোনো নজির চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই। এখন প্রশ্ন হলো, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম এ ঘটনার ব্যাখ্যা কি?

এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, দাজ্জাল প্রতিরোধ করার কারণে এদের সকলকেই মহান আল্লাহ জীবন্ত অবস্থাতেই দুই শহীদ হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন শহীদরা জীবিত এবং রসুল বলেছেন, অভিশপ্ত দাজ্জালকে যারা প্রতিরোধ করবে তাদের মরতবা হবে বদর ও ওহোদ যুদ্ধের শহীদের সমান (আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বুখারী, মুসলিম)। দাজ্জাল

প্রতিরোধকারীগণ হবেন দুই জন শহীদের সমান। সুতরাং আল্লাহ ও রসুলের কথা অনুযায়ী আখেরী যামানার দাজ্জাল প্রতিরোধকারীগণ হবেন মৃত্যুহীন, তারা হবেন জীবন্ত অবস্থাতেই শহীদ, অমর। কার্যতও তাই দেখা যাচ্ছে, দাজ্জালকে প্রতিরোধ করার কারণে এই লোকগুলি দুই শহীদের মরতবা লাভ করছেন। **আপাত দৃষ্টিতে মারা গেলেও তারা প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত এবং অমর।** সে কারণেই ইন্তেকালের পর তাদের দেহ শক্ত হচ্ছে না- নরম থাকছে, মৃতের ন্যায় শীতলও হচ্ছে না।

আমি পুরো বইটিতে রসুলাল্লাহর হাদিসের আলোকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছি যে ইহুদি খ্রিষ্টান সভ্যতাই যে রসুল বর্ণিত দানব দাজ্জাল। এ সত্ত্বেও যারা আমার এ বক্তব্যকে মেনে নিতে দ্বিধা করবেন তাদের বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য আল্লাহর সংঘটিত এই অলৌকিক বিষয়টি বোধ করি যথেষ্ট হবে। আমি যাকে দাজ্জাল বলে চিহ্নিত করেছি সেটা যদি দাজ্জাল না হতো, তাহলে যারা একে প্রতিরোধ করছেন তারা শহীদ হতেন না। সত্যিই যদি ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জাল না হয়ে অনাগত কোনো অতিকায় দানবই দাজ্জাল হতো, বা মানুষের মতোই কোনো জীব হতো তাহলে ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা'-কে প্রতিরোধকারীদের দেহে শাহাদাতের প্রমাণ, জীবিত থাকার প্রমাণ দেখা যেত না।

যে দাজ্জাল মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু, যার বিষয়ে নুহ (আ.) থেকে শুরু করে প্রত্যেক নবী-রসুল তাঁদের উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন, যে দাজ্জালের হাত থেকে স্বয়ং রসুলাল্লাহ আল্লাহর দরবারে পানাহ, আশ্রয় চেয়েছেন, সেই দাজ্জাল এখন আমাদের সামনে উপস্থিত। একাধারে এর চেয়ে সাংঘাতিক বিপদ এবং এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কী হতে পারে? রসুলাল্লাহ বলেছেন, যদি দাজ্জালের আবির্ভাব হয় আর আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকি, তখন আমিই দলিল-প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করবো। **আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তখন তোমাদের প্রত্যেকে দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা তার প্রতিরোধ করবে।** তখন প্রত্যেক মো'মেনের জন্য আমার পরিবর্তে আল্লাহই হবেন সহায়ক (হযরত নওয়াস ইবনে সামান (রা.) থেকে মুসলিম, মেশকাত)।

সুতরাং এখন মানবজাতির সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো ইহুদি খ্রিষ্টান 'সভ্যতা' (দাজ্জাল)-কে প্রত্যাখ্যান করা এবং প্রাণপণে একে প্রতিরোধ করা। আল্লাহর রহমে হেযবুত তওহীদ এই কাজই করছে, পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ তাদেরকে দুই শহীদ হিসাবে কবুলও করে নিচ্ছেন যার প্রমাণ এই মাত্র পেশ করলাম। আল্লাহর রসুল বলেছেন, যারা এই দাজ্জালকে রব, প্রভু বলে মেনে নেবে না, তাদেরকে সে তার জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। এই হাদিসটিও এই আন্দোলনের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দাজ্জালের মানদণ্ডে বিশ্বাসী সামাজিক কাঠামোর নিম্নতম পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত

সর্বক্ষেত্রে হেযবুত তওহীদের অনুসারীগণ চরমভাবে দাজ্জালের অনুসারীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত নিগৃহীত, নিপীড়িত হচ্ছেন। জঙ্গি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগে তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, বহুজনকে নিজ পৈত্রিক ভিটা থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে, সহায় সম্পত্তি লুট করা হয়েছে, অনেকের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনজন পুরুষ ও একজন নারীকে নির্মমভাবে পিটিয়ে শহীদ করা হয়েছে। অর্থাৎ রসুলের কথামত দাজ্জাল তার প্রতিরোধকারীদেরকে তার জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে। এটা হেযবুত তওহীদের জন্য অতি বড় সুসংবাদ, কেননা দাজ্জালের জাহান্নামই হবে প্রকৃতপক্ষে জান্নাত।

এই বইটিকে যেন আল্লাহ তাঁর অপার করুণায় দাজ্জালের বিরুদ্ধে এক দুর্বল প্রতিরোধ হিসাবে কবুল করেন এই কামনা করি। আমীন ॥

লেখক পরিচিতি

দীনুল হক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর যে মোজাহেদগণ আরবের মরুপ্রান্তর থেকে এ উপমহাদেশে এসেছিলেন তাদেরই উত্তরসূরী যামানার এমাম, এমামুয্যামান The Leader of the Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯২৫ সনে টাঙ্গাইলের করটিয়ার ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে হিজরি শাবান মাসের ১৫ তারিখে শবে বরাতের শেষ রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষে তিনি প্রথমে সা'দত কলেজ এবং পরে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন। সেই সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু ঘোষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী এদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

বুদ্ধি হবার পর থেকেই তিনি দেখতে পান সমস্ত মুসলিম জগত কোনো না কোনো পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান প্রভুর গোলাম। তখন থেকেই একটি প্রশ্ন তাঁর মনে নাড়া দিতে থাকে যে, মুসলমান বলে পরিচিত জাতিটিই যদি আল্লাহর মনোনীত জাতি হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই ঘৃণিত দাসত্বের কারণ কি? একসময় আল্লাহর অশেষ রহমে এ প্রশ্নের জবাব তিনি পেতে আরম্ভ করলেন। একটু একটু করে, সারা জীবন ধরে তিনি বুঝতে পারলেন কোথায় সেই শুভংকরের ফাঁকি, যে ফাঁকিতে পড়ে আজ যাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কথা তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বুঝলেন, চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী যে দীনকে সমস্ত জীবনের সাধনায় আরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই দীনটি আর আজ আমরা 'ইসলাম ধর্ম' বলে যে দীনটি অনুসরণ করি এই দু'টি দীন পরস্পরবিরোধী, বিপরীতমুখী দু'টো ইসলাম। ফলে রসুলের নিজ হাতে গড়া জাতিটি এবং বর্তমানের মুসলিম জনসংখ্যাটিও সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তিনি তাঁর এ বোধকে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন গঠনের পর থেকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী এ মহান ব্যক্তি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন হাজার বছরের ফিকাহ, তফসির আর ফতোয়ার পাহাড়ের নিচে যে সহজ-সরল (সিরাতুল মোস্তাকীম) ইসলাম চাপা পড়ে রয়েছে সেই ইসলামকে তার মৌলিক, অনাবিল রূপে উদ্ধার করে মানুষের সামনে উপস্থিত করতে এবং আহ্বান জানিয়েছেন ইহুদি খ্রিষ্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালকে তথা মানুষের সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে তাদের একমাত্র ইলাহ, হুকুমদাতা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। আখেরী যামানায় আবার যখন আল্লাহর দীন কায়েম হবার ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষিত হয়েছে, ঠিক সেই যমানায় এসে যুগপৎ প্রকৃত ইসলামের প্রকাশ ও দাজ্জালের পরিচয় উন্মোচিত হওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর এক মহাপরিকল্পনার ইঙ্গিত।

১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর থেকে হেযবুত তওহীদের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তাঁরই আদর্শের উত্তম অনুসারী নোয়াখালীর সন্তান জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

আমাদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরও কিছু বই

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ
৩. ধর্মব্যবসার ফাঁদে
৪. The Lost Islam
৫. Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)
৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
৮. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
৯. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
১০. যুগসন্ধিক্ষণে আমরা
১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
১২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
১৩. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ.) এর ভাষণ
১৪. ইসলাম শুধু নাম থাকবে
১৫. মহাসত্যের আহ্বান (প্রচারপত্র সঙ্কলন)
১৬. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
১৭. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব
১৮. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
১৯. Divide and Rule: শোষণের হাতিয়ার
২০. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
২১. দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
২২. আসমাউ ওয়া আত্তাবেয়্যু
২৩. ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
২৪. জঙ্গিবাদ সংকট: সমাধানের উপায়
২৫. ধর্মবিশ্বাস: একটি বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান
২৬. শ্রেণিহীন সমাজ সাম্যবাদ প্রকৃত ইসলাম
২৭. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াই
২৮. তাকাওয়া ও হেদায়াহ
২৯. মোমেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকিদা
৩০. সওমের উদ্দেশ্য
৩১. সম্মানিত আলেমদের প্রতি
৩২. সাংবাদিকতার আদর্শলিপি
৩৩. হলি আর্টিজানের পর...
৩৪. পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়
৩৫. রাজধানী সূত্রাপুরে মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম প্রদত্ত ভাষণ
৩৬. ইসলাম কেন আবেদন হারাচ্ছে?
৩৭. হেযবুত তওহীদের গঠনতন্ত্র
৩৮. তওহীদ জান্নাতের চাবি
৩৯. প্রিয় দেশবাসী
৪০. ধর্মের অপব্যবহার প্রগতির অন্তরায়